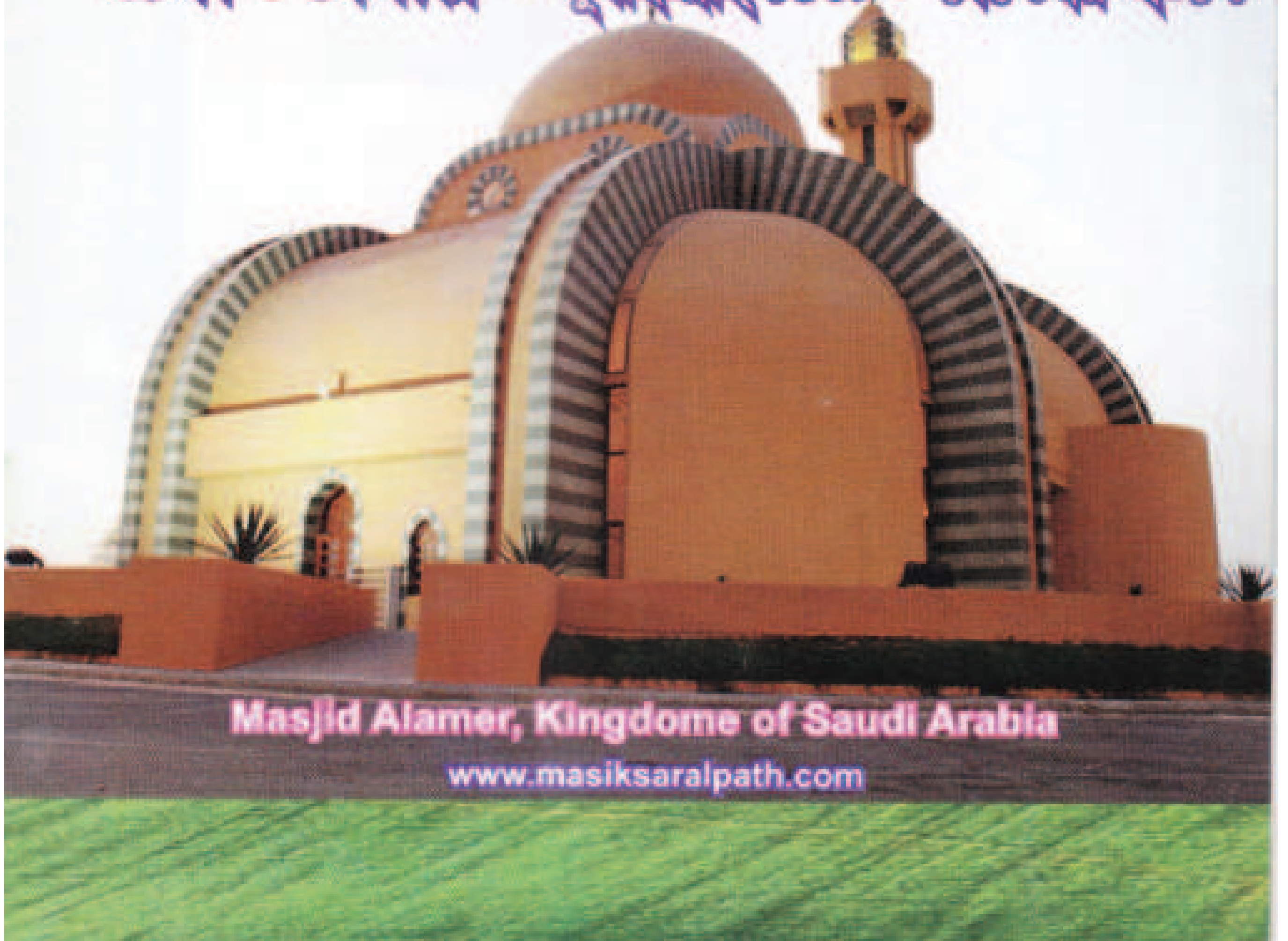
মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • যুলহিজ্জাহ-১৪৩৮ • সেপ্টেম্বর-২০১৭



Masjid Alamer, Kingdome of Saudi Arabia

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা
যুলহাজ্জ-মুহার্‌রম ঃ ১৪৩৮-১৪৩৯ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন ঃ ১৪২৪ বাংলা
সেপ্টেম্বর ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

☆☆ প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অসম্পূর্ণ ও বিস্মৃত প্রায় ইতিহাস

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও সমগ্র ভারত জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো ৭১তম স্বাধীনতা দিবস। অবশ্যই এদিন সমগ্র ভারতবাসীর কাছে আনন্দের খুবই খুশির। কেননা পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মনের একটা ঐকান্তিক দাবীই হলো, ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?''— অথচ এমন আনন্দঘন ও স্বাধীনতার বার্তাবহ দিনটিকে একটি বাংলা দৈনিকের মাধ্যমে যখন জানতে পারলাম মধ্যপ্রদেশ সরকার বিজ্ঞাপিত করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম অথচ সেই বিজ্ঞাপনে ঠাঁই হয়নি একজনও মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম। ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও কি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে চাপা দিয়ে রাখব? সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যারা প্রতিরোধ গড়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ব্রাত্য রেখে কি স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে? ইতিহাস সত্যের আলো থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গহীন আঁধারে ডুবে গেলে তা হবে জাতির জন্য সত্যিই খুব ধংসাত্মক। মারাত্মক ক্ষতি হবে ভাবী প্রজন্মের। ইতিহাস হবে খন্ডিত ও অসম্পূর্ণ। এটা আমাদের জন্য ভীষণ পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুসলিমদের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ণ তো দূরের কথা, বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে ও ইতিহাস চর্চায় মুসলিম বীরদের বীরত্ব গাঁথার ও তাদের আত্মোত্যাগের সত্য তথ্যটুকুও দেওয়া হয়নি। বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছেই তাই অজানা থেকে যাচ্ছে ওইসব পূর্বসুরীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস। স্বাধীন ভারত সহসা ও অতি সহজে আমাদের কাছে আসেনি। হিন্দু মুসলিম, কোল, ডোম, সাঁওতাল ও অপরাপর সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের ফসল হলো এই স্বাধীন ভারত। তাই যারা প্রাণ দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, শক্তি দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনলেন সেই সমস্ত বীর সেনানী, বিশেষকরে মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের আমরা ভুলতে বসেছি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্তভাবে কাম্য। শুধু তাই নয় ভারতীয় জনমানসে সেই সমস্ত বীর সেনানীদের জীবন চরিত তুলে ধরাও একান্তভাবে অপরিহার্য।

শুরু করা যাক বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়া বাঙালী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজিয়া খাতুনকে দিয়ে — প্রথম মহিলা বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কালাপানী সেলুলার জেলে নির্বাসিত হয়ে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমাদের জানা আছে কি ব্যারিষ্টার আসিফ আলির জননী আকবারী বেগমের কথা যিনি তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও আবেগময়ী ভাষণ দিয়ে বাঙালী মেয়েদের অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে ভিড় জমাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "We should hold our religion firm and socially boycott the people who oppose it" অর্থাৎ ''আমাদের ধর্মকে সমুন্নত করতে হবে এবং সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে তাদের যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী।'' আমরা ভুলতে বসেছি সামসুন্নেসা কারিম, রাবিয়া বেগম, নাজমুন্নেসা আহমেদ, অশ্রু হালিম প্রমুখ বাঙালী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। অধিকাংশ ইতিহাস বইয়েই স্থান হয়নি বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আক্রাম খাঁর বীরত্ব গাঁথা। অথচ তাঁর বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত নেতৃত্বের জন্যই খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন এক জনমুখী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল বাঙালী জনজীবনে। আমরা ইতিহাসে স্থান দিতে পারিনি মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয় আব্দুল্লাহ্ বাকী ও মৌলানা আব্দুল্লাহ্ কাফী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাসেম, এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ বাঙালী স্বাধীনতা দরদী ওলামা ও গুনিজনদের। আমরা প্রায় ভুলেই গেছি বীর নায়ক মৌলানা মুজিবুর রহমানের নাম অথচ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'আজাদ' এর মাধ্যমে বাঙালী জনমানসকে অবিরাম সংগ্রামী চেতনার ঝর্ণাধারায় স্নাত করেছিলেন। খোদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে গড়া তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আশরাফুদ্দিন আহমেদকে বর্তমান প্রজন্মের বাঙালীদের কে আর মনে রখেছে?

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কবীর ভ্রাতৃদ্বয় জাহাঙ্গীর কবীর ও হুমায়ুন কবীর যারা অর্থ ও লেখনি দিয়ে বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাদেরই বা কে আজ স্মরণ করে? ''সত্য সেলুকাস, বিচিত্র এদেশ ভারতবর্ষ''। আজ ভারতের সর্বত্র চলছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে গৈরিকীকরণের অপপ্রয়াস। যারা আজ খাঁটি দেশপ্রেমিক বলে সোচ্চার হচ্ছে সেই হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীরা বিশেষ করে গোলওয়ালকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রবক্তারা সেদিন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। সত্যই বর্তমান ভারত পন্ডিত নেহেরুর ভাষায় এক ''দুর্ভাগ্যজনক সময় পর্বের'' মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে যেখানে গান্ধিজির ভাষায় বলা যায়, ''অধর্মই ধর্মের মুখোশ পরেছে।'' এহেন পরিস্থিতিতে দেশের শাসকদলের দায়িত্ব কতখানি সে বিষয়ে জাতির জনক গান্ধিজির মতামতকেই আমরা একবার স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেন, ''ভারতের একজন মুসলিমও যেন জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ না করেন। কোনো ভারতবাসী যেন মনে না করেন, ভারত সংখ্যা গরিষ্ঠের দেশ এবং সংখ্যালঘুরা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।''

আবু ফাইসাল সালমান

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

ধারণা দলীল নয়

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَ اِنۡ تُطِعۡ اَکۡثَرَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ یُضِلُّوۡکَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ.

মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে মুহাম্মাদ ! আপনি যদি পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের অনুসরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে ও জীবন পরিচালনা করে (সূরাতুল আনআম ১১৬)।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا یَتَّبِعُ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ شُرَکَآءَ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ.

জেনে রাখো, আকাশ সমূহে যা কিছু আছে,আর পৃথিবীতে যা আছে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত বস্তু-ব্যক্তি সমূহকে (আল্লাহ্র অংশীদার রূপে) আহ্বান করে তাদের কাছে কামনা-বাসনা প্রকাশ করে (এসব কিছুর) একমাত্র মালিক আল্লাহ্। লোকেরা তো শুধুমাত্র ধারণাপূর্বক এবং অনুমান ভিত্তিক একাজ করে (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৬৬)।

وَ جَعَلُوا الۡمَلٰٓئِکَةَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عِبٰدُ الرَّحۡمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوۡا خَلۡقَهُمۡ سَتُکۡتَبُ شَهَادَتُهُمۡ وَ یُسۡئَلُوۡنَ ○ وَ قَالُوۡا لَوۡ شَآءَ الرَّحۡمٰنُ مَا عَبَدۡنٰهُمۡ مَا لَهُمۡ بِذٰلِکَ مِنۡ عِلۡمٍ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ ○

এরা আল্লাহ্র দাস ফারিশতাহ্ সমূহকে (যারা আল্লাহ্র অবাধ্য নয় এবং আল্লাহ্র নির্দেশকে কার্যকারী করতে সদা প্রস্তুত - সূরাতুত্ তাহরীম ০৬) মহিলারূপে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের সৃষ্টির সময় কি তারা উপস্থিত ছিল ? তাদের সাক্ষ্যকে লিপিবব্ধ করা হবে এবং (এ বিষয়ে) তাদের প্রশ্ন করা হবে। তারা বলে, দয়াবান (স্রষ্টা) ইচ্ছা করলে তাদের (দেব-দেবীদের) আমরা পূজা করতাম না। তাদের বিষয়ে এদের নিকট প্রমাণ্য কোনো জ্ঞান নেই। তারা শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কথা বলে (সূরা যুখ্রুফ্ ১৯-২০)।

উল্লিখিত আয়াত সমূহের পাঠ শেষে পাঠকমণ্ডলীর নিকট স্পষ্ট হবে যে, মহান আল্লাহ্র নিকট অনুমান ও ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। সুতরাং অনুমান ও ধারণা ভিত্তিক কোনো উপাসনা-পূজার্চনা সৃষ্টিকর্তার নিকট কোনো মূল্য নেই, বরং সৃষ্টিকর্তার নিকট এটা ভ্রষ্টতা এবং বিপথগামীতা।

অন্যত্র বলেন —

وَ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ، اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ الۡحَقِّ شَیۡئًا.

তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে অথচ সত্যের সামনে ধারণার কোনো মূল্য নেই (সূরাতুন নাজম, ২৮)।

প্রিয় সত্যান্বেষী পাঠকমণ্ডলী ! মহান আল্লাহ্র উল্লেখিত বাণীসমূহ কতটা অকাট্য। আজ ধর্মের, দ্বীনের নামে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার জন্য বেদলীল কত যে ধারণা সৃষ্টি করে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা পরিসংখ্যানে আনার যোগ্যতার অভাব আমার রয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কুযুক্তি ও বেদলীল ধারণার মাধ্যমে মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে অবৈধ ক্ষমতা ও অর্থ সঞ্চয়ে কোনো প্রকার ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। যত রকমের পীর-মুরীদির কারবার সমগ্র বিশ্বে থাবা মেরে বসে আছে, তার আল্ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দলীল ভিত্তিক যুক্তির কোনোটাতেই স্থান নেই।

একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, 'স্রষ্টা সৃষ্টির রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেন, সে সৃষ্টি যতই তুচ্ছ, অথবা যতই বড় হোক না কেন। এই ভাবনাটাই সম্মানিত সৃষ্টি মানুষকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। এরই ভিত্তিতে নিজেকে স্রষ্টার অবতার, কখনও স্বয়ং স্রষ্টা বলে দাবী করা হচ্ছে। অন্ধ বিশ্বাসী মানুষ যে, যে কোনো

শক্তিকে স্রষ্টার রূপ বলে ধারণা করে, সে নিজের সর্বস্ব সমর্পণে কুণ্ঠাবোধ করেনা। সম্প্রতি 'রাম রহীম গুরমিত সিং' এর ঘটনাবলী আমাদের মাঝে অন্ধবিশ্বাসীদের ঘুম ভাঙ্গাতে হয়তো সাহায্য করতে পারে। সে এ যাবৎ যে প্রকার হম্বিতম্বি করে নিজেকে সৃষ্টি কর্তার অবতার বা মানবরূপী স্রষ্টা হিসাবে দাবী করে আসছিল, একজন সৃষ্টি বিচারকের সামনে, সহায় সম্বলহীন দুর্বল ব্যক্তির সামনে হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াটা কি এ ধরণের ধারণার মূলে বজ্রাঘাত নয়। কত বাবার নোংরামী মাঝে মধ্যে লীকআউট হওয়ার পরেও স্বার্থান্বেষী মানুষেরা ও অন্ধভক্তেরা তাকে লীলারূপেই গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার গোপীনী বেষ্টিত হয়ে থাকাটাকেই প্রমাণ হিসাবে দলীল হিসাবে গ্রাহ্য করেই রাম রহীম গুরমিত সিং নারী সন্ন্যাসীদের নিয়ে ভোগ বিলাসিতার ব্যবসা ভালই চালাচ্ছিল। কিন্তু পাপ কারও বাপ নয়। বিশেষত্ব জঘন্যতম, পুতিময়, দুর্গন্ধযুক্ত — বীর্য বিন্দু হতে সৃজিত মানুষ যদি নিজেকে পূজনীয় মনে করে তাহলে তো তার পতন ঘটবেই। ইসলামের নামে ভণ্ডপীর বাবারাও এম.এস.জি রাম রহীমের চাইতেও নিকৃষ্টতর। যারা জনগণকে হাতানোর জন্য দলীল বহির্ভূত ধারণা সৃষ্টি করে তাদেরকে শোষণ করে। কেননা তারা দাবী করে যে ইসলামে এর অবকাশ রয়েছে। তাদের ভক্তদের এটা ভাববার অবকাশ নেই যে আমরা যা করছি তার অস্তিত্ব ইসলামের সোনালী যুগে নেই কেন? বাবাদের দ্বারা নির্মিত মাজারসমূহের অধিকাংশ স্থানে নারীদের নিয়ে চলে লীলা। আবার অনেক ভক্ত এটাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক রূপে বিবেচনা করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তারা আল্লাহ্‌কে সঠিক রূপে মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হয়নি'' (সূরাতুল আন্‌আম, আয়াত নং ৯১)। তিনি বলেন, ''আমি তাদের হতে কোনো আহারের প্রত্যাশী নই এবং আমি চাই না যে, তারা আমাকে আহার প্রদান করুক'' (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫৭)। তিনি একক, তিনি মুখাপেক্ষাহীন, তিনি কারও পিতা নন, তিনি কারও সন্তান নন, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই (সূরাতুল ইখলাস)। এটাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে চিহ্নিত করার সঠিক মানদণ্ড। তাহলে মানুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করা বাবাদেরকে ঈশ্বর বা স্রষ্টার রূপে কেন পূজা দেওয়া হচ্ছে? মরার পর কবরে যাদের অস্তিত্ব মাটিতে পরিণত হয়েছে তাদের নিকট হতে কেন কিছু প্রত্যাশ্যা করা হচ্ছে?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিকট আমার আবেদন শুধু রাম রহীম নয়, মুসলিম-হিন্দু সব বাবাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য কিছু করুন। জাতি আপনাদের চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

এ যাবৎ আলোচনার উদ্দেশ্য একটাই তা হলো ধারণা দলীল নয়। ধারণা কেন্দ্রীক ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, ধর্মস্থান ইত্যাদি সব বন্ধ হোক।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ধারণা হতে নিজেকে রক্ষা করো, কেননা ধারণা হল সব চাইতে মিথ্যা কথা'' (সহীহুল বুখারী ৫১৪৩)।

ধারণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামের যত প্রকারের বিদআতের উত্থান হয়েছে। শুধুমাত্র সেই উপসনা বা ইবাদাত করা যাবে যার দলীল পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে আছে। যার দলীল বা প্রমাণ নেই তা করা যাবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ আপনারা নিজেদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দলীলের ভিত্তিতে অন্যদের অর্পণ করুন। কেননা মানব সমাজের আপনারাই হলেন অজানা মানুষদের জন্য মুখপাত্র। অতএব দায়িত্ব পালনে ব্রতী হউন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

আশূরা বনাম মুহার্রাম

আতাউর রহমান সালাফী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْـمَدِيْنَـةَ فَرَاَى الْيَهُوْدَ تَـصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ، فَقَالَ : مَا هٰـذَا ؟ قَـالُوْا هٰـذَا يَـوْمٌ صَـالِـحٌ هٰـذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِىْ اِسْـرَائِيْـلَ مِـنْ عَـدُوِّهِمْ فَصَامَـهُ مُوْسٰى، قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَـهُ وَ اَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন; নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (হিজরত করে) মদীনায় এলে দেখেন — ইয়াহূদীরা আশূরার দিনের সওম পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন — এ দিনটি কোন দিন (যে তোমরা সওম পালন করছো)? উত্তরে তারা বলে — এ এক উপযুক্ত দিন, এ এমন দিন, যে দিনে আল্লাহ্ তাআলা (মূসার কওম) বানী ইসরাঈলকে তাঁদের শত্রুর কবল থেকে মুক্তি দান করেন। ফলে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এ দিন (কৃতজ্ঞতা বশতঃ) সওম পালন করেন। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — আমি তোমাদের থেকে মূসার (নীতির) অধিক অধিকারী। ফলে তিনি স্বয়ং সওম পালন করেন এবং অন্যদের সওম পালনের নির্দেশ দান করেন *(বুখারী হাদীস নং ২০০৪, অধ্যায় ঃ আশূরার সিয়াম। সামান্য শব্দের হেরফেরে বুখারীর এই অধ্যায়েই এবং মুসলিমেও একই নামের অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এ হাদীস অন্য হাদীস গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে)।*

আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় হল সওম পালন। এ সওম প্রধানতঃ দু প্রকার — (১) ফরয ঃ যথা রমাযানের এক মাসের সওম। (২) নফল ঃ রমাযানের ফরয সওম ব্যতীত অন্য সওম। রমাযানের সওম ছাড়া আর যে সকল সওম রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পালন করতেন তা যেমন রসূলের উপর আবশ্যিক ছিল না, তেমনি আবশ্যিক নয় তাঁর উম্মাতের উপরেও। আবশ্যিক না হলেও রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বেশ কিছু সিয়াম পালন করেন। অনুপ্রেরণা দান করেন উম্মাতকে তা পালন করার প্রতি। আবশ্যিক নয় এ রকমই এক সওম 'আশূরা' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে এ হাদীসে।

'আশূরা' কী?ঃ— আরবী শব্দ عَشَرٌ (দশ) থেকে তৈরি হয়েছে عَاشُوْرَاءُ (আশূরা)। হিজরী সালের প্রথম মাস মুহার্রামের দশ তারিখকে 'আশূরা' বলা হয়।

আশূরার দিনে করণীয় ঃ মুহার্রাম মাসের দশ তারিখে আমাদের করণীয় কী? এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ হলেন নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। তিনি এদিনে হিজরতের পূর্বে সওম পালন করতেন। হিজরতের পরেও তা অব্যাহত রাখেন। তবে দ্বিতীয় হিজরীতে রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর এ সওম ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়। যার খুশি পালন করবে। যার খুশি ছেড়ে দিবে *(বুখারী, আশূরার সিয়াম, হাঃ নং ২০০২)*।

এ দিনের সওম ফরয নয়, তবে রমাযানের পর যত সিয়াম রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''রমাযানের পর সর্বোত্তম সওম হল মুহার্রাম মাসের সওম'' *(মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুহার্রাম মাসের সওমের ফাযীলাত, হাদীস নং ১১৬৩-২০২, ২০৩)*। নফল সওমপ্রেমীদের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ এক বিশেষ উপহার। তবে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে যে এ সওম যেন ফরযের মানসিকতায় পালিত না হয়।

আশূরার সওম কয়টি ঃ আশূরা বলতে মুহার্রাম মাসের দশম তারিখকে বোঝায়। তাই আশূরার সওম হল উক্ত তারিখে একটি — একথাই এ হাদীস দ্বারা ফুটে উঠেছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হিজরতের পূর্বে ও পরে একটি সওমই পালন করতেন। পরবর্তীতে কোনো এক সময় সাহাবীরা বলেন, ''হে আল্লাহ্র রসূল! এ এমন একদিন যাকে ইয়াহূদী ও নাসারারা মহিমান্বিত মনে করে।'' রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রত্যুত্তরে বলেন, ''আগামী বছর ইন্শাআল্লাহ্ নবম তারিখেও সওম পালন করবো।'' বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু পরবর্তী মুহার্রামের পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন) *(মুসলিম ১১৩৪-১৩৩)*। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রয়াণ ঘটলেও যেহেতু নয় তারিখেও তিনি সওম পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন তাই আশূরা (দশম মুহার্রাম) নামকরণ হলেও নবম ও দশম দু দুদিনের সওম পালন উম্মাতের জন্য আদর্শ রূপে কার্যকরী হয়ে

যায়। যদি কারো কোনো কারণে ৯ তারিখে সওম পালন সম্ভব না হয় তবে ১০ তারিখের সাথে ১১ তারিখ সংযুক্ত করে সওম পালন করবে।

সওমের মূল দিন হল দশ মুহার্রাম। ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিরোধীতার জন্য ৯ তারিখের সংযুক্তি। কাজেই মূল দিনের সওম পালনের সাথে ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে বৈসাদৃশ্য হলেই অর্জিত হবে আসল উদ্দেশ্য। তবে যেহেতু নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ৯ তারিখের সংযোজনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাই ৯ তারিখের সংযুক্তির সাথে এ সওম পালনই উত্তম।

এ সওমের ফাযীলাত ঃ মানুষ শয়তান কর্তৃক ধোঁকার শিকার হয়ে রূপ লাবণ্যময়ী পৃথিবীর নানা মোহে পড়বে এটিই স্বাভাবিক। এ মোহের বশবর্তী হয়ে কাবীরা গুনাহও করে ফেলতে পারে। ঈমানদীপ্ত একজন মানুষ কাবীরা গুনাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ফিরে আসে তা থেকে। কিন্তু চলাফেরায় মানুষের বিভিন্নভাবে স্বাগীরা গুনাহ হয়ে যায় অহরহ। এ গুনাহ, স্বাগীরা হওয়ায় এর প্রতি মানুষের তেমন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। মহান আল্লাহ্ এ ভ্রূক্ষেপহীন স্বাগীরা গুনাহ্কেও নির্মূল করার জন্য দিয়েছেন বহু উপায়। যার অন্যতম হল এ আশূরার সওম। এ সওম নিছক উপবাস নয়। নামে দশম মুহার্রামের সওম, কামে শুধু দিবাভাগে দু দিনের পানাহার ত্যাগ, পরিণামে বিগত এক বছরের স্বাগীরা গুনাহ থেকে মুক্তি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আশা রাখি আল্লাহ্ তাআলা আশূরার সিয়াম দ্বারা পূর্বের এক বছরের অপরাধ খণ্ডন করে দেবেন'' *(মুসলিম হাঃ নং ১১৬২-১৯৬, অধ্যায় ঃ প্রতি মাসে তিনটি, আরাফা, আশূরা এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম পছন্দনীয়)*। এছাড়াও রয়েছে সকল সিয়ামের ফাযীলাত সম্বলিত অপর হাদীস। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি নিষ্কলুষভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একটি সওম পালন করে, আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে করে দেন'' *(বুখারী হাঃ নং ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩)*।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ এ দিনের সওমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এক মহান ঐতিহাসিক বিষয়। বিষয়টি দার্সে হাদীসের জন্য নির্বাচিত হাদীসে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুসলিমের ১১৩০ নং হাদীসে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে — এ দিনে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর কওমকে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন। পক্ষান্তরে ফিরআউন ও তার সহযোগীদের ডুবিয়ে মারেন। এর শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এ দিন সওম পালন করেন। নাবী মূসার উত্তরসূরী নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)ও সেই স্মৃতি বিষয়ে ঘোষণা দান করলেন 'আমি মূসার আদর্শ পালনের অধিক হকদার।'

এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। যেমন আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) এর পৃথক পৃথক স্থানে দুনিয়ায় অবতরণ, উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ, নূহ আলাইহিস্ সালামের কিস্তী জুদী পর্বতে কিনারস্থ হওয়া, ইউনূস আলাইহিস্ সালামের মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাও নাকি মুহার্রাম মাসের ১০ তারিখে সংঘটিত হয়। কিন্তু এ সকল বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে কোনো বর্ণনা বহু সন্ধান করেও আমি পাইনি।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত শারীআত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উম্মাতকে শিখিয়ে দেন। দশম মুহার্রামকে কেন্দ্র করে করণীয় তার অন্যতম। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১০ হিজরীর বিদায় হজ্জে ৯ যুলহিজ্জার ঐতিহাসিক ভাষণে উপস্থিত এক লাখ চব্বিশ কিংবা এখ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবাবর্গের নিকট জানতে চান, তিনি তাঁর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন কি না? উপস্থিত সাহাবাবর্গ সাক্ষী দেন যে, তিনি তাঁর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখেন এই বলে যে, আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো, আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো, আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো *(বুখারী, ৪৪০৩, মুসলিম ১২১৮)*।

এরপর মহান আল্লাহ্ এ দিনই শরীআতে সিলমোহর লাগিয়ে ঘোষণা দেন, 'আজ তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলাম তোমাদের দ্বীন হওয়ায় আমি সম্মত (৫/৩) *(আর্ রাহীকুল মাখতূম, অখণ্ড সংস্করণ ৭৬৪- ৬৮ পৃষ্ঠা)*।

এ সময় থেকে মাত্র তিন মাসের মাথায় তিনি আল্লাহ্র ডাকে লাব্বায়েক বলে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। সম্পূর্ণরূপে মোহর লেগে যায় শরীআতী বিধিবিধানের স্বীকৃতি প্রদানে।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রয়াণের পর তাঁর নাতী হুসাইনকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় এক হৃদয় বিদারক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনাটি ঘটে কাকতলীয়ভাবে মুহার্রাম মাসের দশ তারিখে। আর এ ঘটনাই আজ যেন আসল মুহার্রাম। মুহার্রামের আশূরার আসল ইবাদাত আজ মুমিনদের অজানা। ধামাচাপা পড়েছে তার প্রতি আমলও। বাজার পেয়েছে কাকতালীয়

তারিখী মিলের ঘটনাই। অথচ এ ঘটনা নবুঅত প্রাপ্তির ৭৩ বছর পরবর্তী, মদীনা হিজরতের ৬০ বছর পরবর্তী, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দ্বীনের দায়িত্ব সফলভাবে পৌঁছে দিয়েছেন সে সাক্ষী আল্লাহ্‌কে বানানোর ও আল্লাহ্ কর্তৃক দ্বীন পূর্ণতা ঘোষণার ৫০ বছর পরবর্তী, ৫০ বছর পরবর্তী রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুরও এবং চার খলীফার খেলাফাত শেষ হওয়ার ২০ বছর পরবর্তী। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পর ইসলামী শাসনভার পর্যায়ক্রমে অর্পিত হয় আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর। এরপর খলীফা নির্বাচনে দেখা দেয় সমস্যা। সৃষ্টি হয় উদ্ভূত পরিস্থিতি। সালটি হল ৬১ হিজরী। এ সময় জীবিত থাকা ষাট জন সাহাবীর মধ্যে আটান্ন জন সাহাবীসহ ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ মুআবিয়ার১ পুত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে মেনে নিয়ে শপথ দান করেন। যে দুজন সাহাবী বিরত ছিলেন তাঁরা হলেন হুসাইন বিন আলী ও আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। কূফাবাসীর পক্ষ থেকে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অনুরোধ আসতে থাকে — তথায় গিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের। হুসাইনকে খলীফা হিসাবে মেনে নিতে সম্মতি জানিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলের হাতে ১২-১৮ হাজার লোক বাইআত গ্রহণ করেন। এ খবর পেয়ে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি কূফার সন্নিকটে পৌঁছলে গভর্ণর ওবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদের দ্বারা রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে সপরিবারে নির্মমভাবে শহীদ হন। এ স্থানটি ছিল 'কারবালা', তারিখ ছিল ১০ই মুহার্রাম। এই ঘটনা আজ 'কারবালার ঘটনা' এবং মুহার্রাম নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক — আল্ বিদায়াহ্, আল ইসাবাহ্, তাহযীবুত্ তাহযীব সহ অন্যান্য সকল ইতিহাস গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুসাইন প্রীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে কত যে অনৈসলামিক রীতিনীতির, তা পাঠক মহল সম্যক অবগত। এর সাথে শরীআতী মুহার্রামের মিল ও আশূরার সামঞ্জস্য কতটুকু তা স্পষ্ট। তবুও একে কেন্দ্র করে দ্বীনের নামে সাধারণ বিদ্‌আতই নয় হাজারো অপকর্ম চলছে রমরমিয়ে। স্কুল, কলেজ, ইউনির্ভাসিটির শিক্ষক, শিক্ষানবিশ, অফিস-আদালতের কর্মচারী, ব্যবসিক-বুদ্ধিজীবি মুহার্রাম বলতে সকলেই জানেন কাকতালীয় তারিখী মিলের শরীআত বহির্ভূত ঘটনাকেই। এ ঘটনাই দখল করেছে সরকারী ছুটির তালিকা। এ রকম ডুপলিকেট মুহার্রাম উপহার দিয়েছি ও দিয়ে চলেছি রসূলের নামের কালেমা পড়া তথাকথিত মুসলিমরাই।

আশূরার শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ঃ 'আশূরা' শুধু সওম পালনের ইঙ্গিত বহন করে না, এতে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য নিহিত রয়েছে একগুচ্ছ শিক্ষণীয় বিষয়। কয়েকটি বিষয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকলেও স্থানাভাবে কিছু বিষয় শুধু উল্লেখ করা হল। পাঠক মহল গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ বুঝতে সক্ষম হবেন।

❋ 'আশূরা' ঈমান ও কুফরের সাথে সংঘটিত সংঘর্ষের এক ঐতিহাসিক দিন। ❋ এর প্রভাব পূর্ব উম্মাতেও ছিল, কেননা কুরাইশরা ইসলাম আগমনের পূর্বেও এ দিনে সওম পালন করত। ❋ বংশ, ভাষা ও যুগের তারতম্য যাই হোক না কেন সকল মুসলিম উম্মাহ্ একে অন্যের প্রতি সহমর্মী, সহানুভূতিশীল ও দ্বীনী ভাতৃত্বে আবদ্ধ। ❋ নাবীগণ একে অপরের হকদার। ❋ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্ব নাবীদেরও উত্তরসূরী। ❋ আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করে জয়ী করেন, এ বিষয়ের এক স্মৃতিফলক হল আশূরা। ❋ বাহ্যত জনবল, বিত্তবল ও প্রযুক্তিবল আল্লাহ্‌র বল ও কৌশলের নিকট অতি অতি তুচ্ছ। ❋ 'আশূরা' দ্বীন শত্রুদের জন্য ধ্বংসসূচক এক সাইরেন ধ্বনী। ❋ হকের পথে অটল থাকার এক অনুপ্রেরণা হল 'আশূরা'। ❋ মুশরিকী নীতি বা দ্বীন বিরোধীদের নীতির বিরোধিতা করা সাহাবীদের নিকট এক সাব্যস্ত নিয়ম ছিল। এ রকম বিরোধীতা একজন মুমিনেরও আদর্শ। ❋ কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান বা খুশি উদ্‌যাপন হল ইয়াহুদী নীতি। কেননা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়াহুদীরা সওম পালনের সাথে সাথে ঈদও পালন করত। ❋ আশূরায় একদিনের সওম পালনের ফলে পূর্ণ এক বছরের অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে একজন মুসলিম আল্লাহ্‌র মহানুভবতার শিক্ষা পায়। ❋ কৃতজ্ঞতা বাস্তবায়ণ যেমন বাক্য দ্বারা হয় তেমনি কর্ম দ্বারাও হয়। ❋ রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর এ দিনের সওম ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়। এর দ্বারা ফরয ও নফলের তারতম্য সূচিত হয়।

আসুন ১০ই মুহার্রামের আসল ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জনগণকে অবগতি দানে হই অগ্রসর। তুলে ধরতে সক্ষম হই আল্লাহ্‌র রসূলের অনুমোদিত মুহার্রাম পালন। অর্জনে সক্ষম হই এ রকম মুহার্রাম পালনের উপহারও।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে আশূরার আসল ইতিহাস জানার এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করো — আমীন।

৩৪ পর্ব

بَابُ الْحَيْضِ ❶ وَ النِّفَاسِ

হায়েয ও নেফাসের বিবরণ

বিবিধ

৯৬। সঙ্গম ব্যতীত হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের বিধান

সঙ্গম না করে হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা মুবাহ্ ও বৈধ। নীচের হাদীসগুলি এর দলীল —

(ক) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যৌন সঙ্গম ব্যতীত তোমরা সব কিছুই কর''।[১]

(খ) একজন লোক আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে জানতে চাইলেন, ''আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন তার কী কী আমার জন্য হালাল?'' নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ''সায়ার উপরে সব কিছুই তোমার জন্য হালাল''।[২]

(গ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, ''যখন আমাদের মধ্যে কেউ হায়েযা হত, আর আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইতেন, তখন তিনি তাঁকে কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থানকে আবৃত করার হুকুম দিতেন, সেই সময়ে হায়েযের রক্ত বেশি প্রবাহিত হত। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সঙ্গে সহবাস করতেন অর্থাৎ সঙ্গে থাকতেন।''[৩]

৯৭। হায়েয শেষে গোসল করার পূর্বে একসঙ্গে থাকার বিধান

আল্লাহ্ তাআলা বলেন — اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّ ❷

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থেকো। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ যেভাবে তোমাদের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে তাদের নিকট যাও'' (সূরাহ বাক্বারাহ্, আয়াত নং ২২২)।

১। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৮০।

২। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ১৯৭, কিতাবুত তাহারাত : বাবুন ফিল মাযী, আবূ দাউদ ২১২)।

৩। বুখারী ৩০২, কিতাবুল হায়েয : বাবু মুবাশারা তিল হায়েযে আহমাদ ৬/১৭৩, দারেমী ১/২৪২, মুসলিম ২৯৩, আবূ দাউদ ২৬৮, তিরমিযী ১৩২, ইবনু মাজাহ্ ৬৩৫, আল্ ইহসান লি ইবনে হিব্বান ২/৪৬৭, বাইহাকী ১/৩১০, শারহুস সুন্নাহ্ ১/৪১১।

এই আয়াতে হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করার জন্য দুবার পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ حتى يطهرن এবং فاذا تطهرن প্রথম পবিত্রতার অর্থ সকলের ঐক্যমতে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া। কিন্তু দ্বিতীয় পবিত্রতার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এর অর্থ গোসল করে পবিত্র না কেবল হায়েয থেকে পবিত্র?

(ইবনু আব্বাস রাঃ) — এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন — حتى يطهرن অর্থাৎ সে রক্ত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। فاذا تطهرن অর্থাৎ সে পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করবে।[১]

(ইবনু কাসীর রহঃ) — ওলামাদের ঐক্যমত রয়েছে যে, হায়েযের রক্ত যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সে পানি দিয়ে গোসল করা পর্যন্ত বা পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে তায়াম্মুম করা পর্যন্ত স্ত্রী হালাল হবে না।[২]

(জমহুর, মালেক রহঃ) স্বামীর জন্য হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা ততক্ষণ বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে পানি দিয়ে গোসল করবে।[৩]

(মুজাহিদ, ইকরামা) — হায়েযের রক্ত বন্ধ হলেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল, কেবল সে অযু করবে।[৪]

(আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ) — যদি দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করার পূর্বেই তার সঙ্গে সঙ্গম ও সহবাস করা বৈধ। আর যদি দশ দিনের আগেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল বা স্বলাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সঙ্গম জায়েয নয়।

(ইবনু হায্ম রহঃ) — গোসল ছাড়াও সঙ্গম বৈধ।[৫]

(আলবানী রহঃ) — এ কথাই বলেছেন।[৬]

(কুরতুবী রহঃ) — فاذا تطهرن এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ঋতুবতী মহিলা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে অর্থাৎ গোসল করবে।[৭]

(শওকানী রহঃ) — তিনি تطهرن এর অর্থ করেছেন গোসল করার এবং গোসলের পূর্বে সঙ্গম করাকে হারাম বলেছেন।[৮]

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক ঃ জমহুর ওলামাদের মতামতটি রাজেহ। কেননা تطهرن এর রাজেহ অর্থ গোসল করা। তাছাড়া ইবাহাত বা মুবাহ ও তাহরীম বা হারামের মধ্যে সংশয় হলে তাহরীমকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

১। তাইসীরুল আলিইল কাদীর ১/১৮১।
২। তাফসীর ইবনু কাসীর, বে তাহকীকে আব্দির রাযযাক মাহদী ১/৫২২)।
৩। তাফসীর ফাতহুল কাদীর ১/২২৬।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। আল মুহাল্লা বিল আসার ১/৩৯১।
৬। আদাবুয যেফাফ ৪৭।
৭। তাফসীরে কুরতুবী ২/৮৮।
৮। তাফসীর ফাতহুল কাদীর ১/২২৬।

৯৮। হায়েযের অবস্থায় সঙ্গম করার কাফ্ফারা

(১) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে মানুষ ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তার উদ্দেশ্যে বলেছেন — يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ হায়েযা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমকারী ব্যক্তি এক দীনার বা অর্ধ দীনার সাদকা করবে।[১]

(২) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, যদি মাসিকের প্রথম অবস্থায় সঙ্গম করে, তাহলে এক দীনার আর যদি রক্ত শেষ হওয়ার পর সঙ্গম করে তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করবে।[২]

(৩) অন্য একটি বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, সঙ্গমকালীন যদি লাল রক্ত থাকে, তাহলে এক দীনার আর যদি হলুদ বা মেটে রঙের রক্ত থাকে, তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করতে হবে।[৩]

উল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে বোঝা গেল যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম হাসান বাসারী, সায়ীদ বিন জুবায়ের, ইমাম কাতাদাহ্, ইমাম আওযায়ী, ইমাম ইসহাক, ইমাম আহমাদের দ্বিতীয় বর্ণনায় এবং শাফেয়ী (রহঃ) দের প্রাচীন মতামত অনুযায়ী এটাই রাজেহ। অবশ্য তাঁদের কাফ্ফারার বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে।

(হাসান বাসারী, সায়ীদ বিন যুবায়ের রহঃ) — এ রকম মানুষ একটি কৃতদাস স্বাধীন করে দেবে। মুক্ত করে দেবে।

(জমহুর) — দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদকা করবে।

(মালেক, আবূ হানীফা রহঃ) — এর জন্য কোনো কাফ্ফারা লাগবে না, কেবল তাওবা ও ইসতিগফার করা ওয়াজেব। তাঁদের নিকটে কাফ্ফারার বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলি মুযতারাব ও দলীলের অযোগ্য। ইমাম আতা বিন আবী মুলাইকা, ইমাম শা'বী, ইমাম নাখরী, ইমাম মাকহুল, ইমাম আবুয যিনাদ, ইমাম রাবীয়া, ইমাম হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান, ইমাম ইবনু মুবারক, ইমাম আইউব, সাখতিয়ানী, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম লাইস বিন সাআদ, ইমাম শাফেয়ী থেকে সেটি বেশি সহীহ্ বর্ণনা রয়েছে এবং ইমাম আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহ্ আজমাঈন থেকেও একটি বর্ণনায় এ মতামত বর্ণিত হয়েছে।[৪]

(শওকানী রহঃ) — ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'দীনার বা অর্ধ দীনার' ওয়ালা হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, ''নিশ্চয় আপনি জেনে গেছেন যে, প্রথম বর্ণনাটি দলীলের যোগ্য। সুতরাং সেদিকেই ফিরে যাওয়া জরুরী অর্থাৎ ইনিও দীনার বা অর্ধ দীনার সাদকা করার পক্ষপাতি।[৫]

(নওয়াবী রহঃ) — যদি কোনও মুসলিম এ বিশ্বাস করে যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হালাল, তাহলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। যদি কেউ এ রকম বিশ্বাস বা আকীদা না রেখে ভুল করে বা হারাম অথবা হায়েযের খবর না থাকার কারণে সঙ্গম করে, তাহলে গুনাহ্ হবে না এবং কাফ্ফারাও লাগবে না। আর যদি কেউ হায়েয ও হুরমাতের খবর জানা সত্বেও সঙ্গম করে তাহলে তার কাবীরা গুনাহ হবে। এজন্য এমন লোকের পাপ থেকে তাওবা করা ওয়াজেব।[৬]

(সাইয়েদ সাবেক রহঃ) — এমন ব্যক্তির উপর কোনও প্রকার কাফ্ফারা নেই।[৭]

১। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ২৩৭, কিতাবুত তাহারাত : বাবু ইত্ইয়ানিল হায়েযে, আবূ দাউদ ২৬৪, আহম্মাদ ১/২২৯, দারেমী ১/২৫৪।

২। সহীহ্ মাওকুফ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ২৩৮ কিতাবুত তাহারাত : বাবু ইতইয়ানিল হায়েয, আবূ দাউদ ২৬৫।

৩। সহীহ্ মাওকুফ ঃ সহীহ্ তিরমিযী ১১৮, কিতাবুত তাহারাত : বাবু মা জাআ ফিল কাফ্ফারাতে ফী ইতইয়ানিল হায়েযে, তিরমিযী ১৩৭।

৪। নাইলুল আওতার ১/৪০৮, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৪৪৪, মাআলিমুস সুনান ১/৮৩-৮৪, আল মুগনী ১/৪১৬-৪১৭।

৫। নাইলুল আওতার ১/৪০৮।

৬। ফিকহুস সুন্নাহ্ ১/৭৭।

৭। প্রাগুক্ত।

(শাইখ উসাইমিন রহঃ) — তাওবার সঙ্গে সঙ্গে দীনার বা অর্ধ দীনার যে কোনো একটি কাফ্ফারা দিতে হবে।[১]

(শাইখ আব্দুর রহমান নাসের সাআদী) — দীনার বা অর্ধ দীনার সাদকা করবে যেমন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[২]

রাজেহ ঃ নিশ্চয় কাবীরা গুনাহ করে তাওবা করা জরুরী কিন্তু এখানে তাওবার সঙ্গে সঙ্গে দীনার বা অর্ধ দীনার কাফ্ফারাও লাগবে। যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে এতটাই প্রমাণিত। তবুও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দীনার বা অর্ধ দীনার সম্পর্কিত মাওকুফ হাদীসের প্রতি নজর রাখা উত্তম।

এবং সে সিয়াম কাযা করবে ❶	وَ تَقْضِ الصِّيَامَ

❶ মাআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞাসা করলেন - ঋতুবতী মহিলা সিয়ামের কাযা তো করে কিন্তু স্বলাতের কাযা করে না কেন ? উত্তরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, রসূলুল্লাহ্‌র সাথে আমাদের এরকম অবস্থা হত فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَ لَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ তো আমাদেরকে সিয়াম কাযা করার আদেশ করা হত, স্বলাত কাযা করার আদেশ করা হতো না।[৩]

(নওয়াবী রহঃ) এ মসলায় মুসলিমদের ইজমা রয়েছে।[৪]

(শওকানী রহঃ) — এ মসলায় উম্মতের সালাফ ও খালাফ এবং প্রবীন ও নবীন সকলের ইজমা রয়েছে । মুসলিম ওলামাদের এ বিষয়ে কারোর কোনো মতপার্থক্য নাই।[৫]

(ইবনু যুনযির) — ওলামাগণ এ কথায় সহমত পোষণ করেছেন যে, হায়েযের অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া স্বলাত কাযা করা ঋতুবতী মহিলার জন্য ওয়াজেব নয়। অবশ্য এ অবস্থায় তাদের সিয়াম কাযা করতে হবে।[৬]

ইমাম ইবনু আব্দির রহমান লিখেছেন যে, খারেজীদের একটি দল হায়েযা মহিলার জন্য স্বলাতের কাযাকে ওয়াজেব করে দিয়েছে।[৭]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ) — (খারেজীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে) উম্মাতের ইজমায় এমন লোকেদের বিরোধীতা — যারা জাহান্নামের কুকুর, কোনো প্রভাব পড়বে না।[৮]

১। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৮০।

২। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৯।

৩। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ২৩৬, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবুন ফিল হায়েযে লা তাকযিস স্বলাত, আবূ দাউদ ২৬৩, আহমাদ ৬/২৩২, বুখারী ৩২১, মুসলিম ৩৩৫, তিরমিযী ১৩০, নাসায়ী ১/১৯১, ইবনু মাজাহ্ ৬৩১, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩২৪, দারেমী ১/২৩৩, বাইহাকী ১/৩০৮।

৪। আল মাজমূ ২/৩৫১-৩৫৫।

৫। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৪৮।

৬। আল ইজমা লি ইবনে মুনযির পৃঃ ৩৭, সংখ্যা ২৮, ২৯।

৭। মাকালাতুল ইসলামিইন লি আবীল হাসান আল্ আশআরী পৃঃ ৮৬-১৩১, আল্ ফারকু বাইনাল ফিরাক লিল বাগদাদী পৃঃ ৭২-১১৩।

৮। আররাওযাতুন নাদিয়্যাহ্ ১/১৯০।

৪র্থ পর্ব

اَلْهَدِيَّةُ الذَّهَبِيَّةُ مِنَ الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ

উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

মূল (উর্দূ) শাইখ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ
সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ সানাবিলী

(৬) আল্লাহ্ তাআলা কি স্বীয় সত্তার সাথে সর্বত্র বিরাজমান ?

প্রশ্ন ঃ সূরাতুল হাদীদ এর চতুর্থ আয়াতের আলোকে একথা বলা কি সঠিক হবে ''আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সত্তার সাথে সর্বত্রই বিরাজমান'' যদি সঠিক না হয় তবে এর দলীল কি হবে? (আবুল মাতীন, মাডাল টাউন, লাহোর)

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

অর্থ ঃ তিনিই ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেঅছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন (সূরা আল্ হাদীদ ৫৭/৪, আল-কিতাব / ডাক্তার মুহাম্মাদ উসমান ৩২৪ পৃঃ)।

উক্ত আয়াতে وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ (তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন।) এর বিশ্লেষণে কুরআনের প্রাচীন মুফাস্সির ইমাম মুহাম্মদ ইবনু জারীর ইবনে ইয়াযীদ আত্তাবারী রাহেমাহুল্লাহ্ (মৃতু ৩১০ হিজরী) বলেন—

وَ هُوَ شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اَيْنَمَا كُنْتُمْ يَعْلَمُكُمْ وَ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَاكُمْ وَ هُوَ عَلٰى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ.

অর্থ ঃ এবং হে লোক সকল তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের প্রামানিক সাক্ষ্য। তিনি তোমাদের আমালসমূহ, গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তিনি নিজের সাত আকাশের উপর স্বীয় আরশে সমাসীন (তাফসীরে তাবারী ২৭/১২৫)।

একই অর্থ সম্বলিত অন্য একটি আয়াত সম্পর্কে মুফাস্সিরে কুরআন যাহ্যাক ইবনু মুযাহিস আল-হিলালী আল-খুরাসানী রাহেমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু ১০৬ হিজরী) বলেন —

هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَ عِلْمُهُ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ্) আরশে সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞান তাঁদের সাথে (লোক সকলের সাথে) আছে তাঁরা যেখানেই হোক না কেন (তাফসীরে তাবারী ২৮/১০ সূত্র হাসান)।

ইমাম মুক্বরী মুহাক্কিক্ব মুহাদ্দিস আসারী আবূ উমার আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ্ আত্তালমানকী আল-আন্দুলুসী রাহেমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী) বলেন, আহলে সুন্নাত (আহ্লে হাদীস) মুসলিমরা এ মর্মে একমত যে, (وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।) সূরাতুল হাদীদ ৫৭/৪ ইত্যাদি আয়াতের উদ্দেশ্য হল —

أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ وَ أَنَّ اللّٰهُ فَوْقُ السَّمَاوَاتِ بِذَاتِهِ مُسْتَرٍ عَلٰى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ.

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই এর অর্থ ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র জ্ঞান। আল্লাহ্ স্বীয় সত্তার সাথে আকাশসমূহের উপরে নিজ আরশে সমাসীন যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয় (শারহু হাদীননুযুল লে ইবনে তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ্ ১৪৪, ১৪৫ পৃঃ)।

উক্ত ইজমা থেকে বুঝা গেল যে, এ আয়াত থেকে প্রমাণ উপস্থান করে কিছু লোকের একথা বলা যে, ''আল্লাহ স্বীয় সত্তার সাথে সর্বত্রই বিরাজমান'' ভুল এবং বাতিল কথা। সুতরাং কুরআন, হাদীস ও ইজমা বিরোধী হওয়ায় কথাটি খণ্ডনীয় ও প্রত্যাখ্যাত।

প্রশ্নকৃত আয়াতে কারীমায় (يَعْلَمُ অর্থঃ তিনি জানেন) শব্দ ও স্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে সাথে থাকার অর্থ হল জ্ঞান ও ক্ষমতা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমাদের মুহতারাম শিক্ষক শাইখ বাদীউদ্দীন শাহ আর্‌রাশেদী রাহেমাহুল্লাহ্ এর বই 'তাওহীদে খালেস' (২৭৭ পৃঃ)।

হারেস ইবনু আসাদ আল-মুহাসেবী রাহেমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু ২৪৩ হিজরী) বলেন, وَ كَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ অর্থ ঃ আর তেমনিভাবে একথা বলা ও বৈধ নয় যে, ... আল্লাহ্ যমীনে আছেন (ফাহমুল কুরআন ওয়া মায়ানীহে, চতুর্থ ভাগ, অনুচ্ছেদ, মা'লা, ইয়াজুযু ফীহিন্ নাসখ)।

হাফেয ইবনুল জাওযী বলেন, (জাহমীদের একটি দল) 'মুলতাযিমাহ্ তো আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তাআলাকে সর্বত্র বিরাজমান' বলে দিয়েছে (তালবীসে ইবলীস ৩০ পৃঃ, আমার বই : বিদ্‌আতীকে পীছে নামায কা হুকুম ১৯ পৃঃ)।

শাইখ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহেমাতুল্লাহ্ আলায়হী বলেন, আর একথা বলা বলতে হবে যে, তিনি আরশে আছেন (গুনিয়াতুত্তালিবীন ১/১০০, আরো দেখুন আল হাদীস ১০/৪৩-৪৬, ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ ১/২৯-৩০)।

(৭) আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকার এবং নিকটে থাকার অর্থ কি?

প্রশ্ন ঃ আহ্‌লে হাদীসগণ আল্লাহ্ তাআলাকে আরশে সমুন্নত মানেন এবং مَعَكُمْ তোমাদের সাথে এবং اِنِّى قَرِيْبٌ নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তীর ব্যাপারে বলেন, 'সঙ্গ ও নিকটস্থ'-র অর্থ হল আল্লাহ্‌র জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দৃষ্টি। এটা কি তাবীল (অপব্যাখ্যা) নয়? সৌদী আরবের কিছু উলামা যেমন (মুহাম্মাদ ইবনু) সালেহুল উসাইমীন রাহেমাহুল্লাহ্ প্রমুখ এবং কিছু পাকিস্তানী সালাফী উলামাগণ বলেন, আমরা استرٰى অর্থাৎ সমাসীন হওয়াকে কোনো অবস্থা ও প্রকৃতি বর্ণনা না করে বিশ্বাস করি তেমনিভাবে সঙ্গে থাকা এবং নিকটে থাকাকেও কোনো অবস্থা ও প্রকৃতি বর্ণনা না করেই মানি। আল্লাহর মর্যাদার জন্য যেভাবে শোভনীয় তিনি সমাসীন আছেন এবং যেভাবে তাঁর মর্যাদার জন্য শোভনীয় তিনি নিকটে ও আছেন এবং সাথেও আছেন। আমরা কোনো তাবীল (অপব্যাখ্যা) করি না। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী সম্বলিত আয়াত সমূহ মিলযুক্ত, আমরা তাতে কোনো চিন্তা ভাবনা এবং তার কোনো অপব্যাখ্যা না করেই আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদার জন্য যেভাবে উপযোগী সেই রকমই তাঁর গুণাবলী প্রমাণিত।

সম্মানিত শাইখ! দলীল সহকারে বিশ্লেষণ করবেন (সালীম আখতার করাচী)।

উত্তর ঃ মুক্বাতিল ইবনু হায়য়ান (আন্ নাবাতী আল মুফাস্‌সির) وَ هُوَ مَعَكُمْ এর বিশ্লেষণে বলেন, عِلْمُهُ তাঁর জ্ঞান (আল্ আসমা অস্ সিফাত লিল বায়হাকী ৪৩১ পৃঃ দ্বিতীয় কপি ৫৪২ পৃঃ সূত্র হাসান)। মুফাস্‌সির বাইহাক ইবনু মুযাহিম বলেন, وَ عِلْمُهُ مَعَهُمْ এবং তাঁর জ্ঞান তাঁদের (লোক সকলের) সাথে আছে। আস্ সুন্নাহ লে আকিল্লাহ্ ইবনে আহমাদ ৫৯২ সূত্র হাসান। আ কাহত্বানী ভুল করে বলেছেন এর সূত্র দুর্বল)।

মুফাস্‌সিরে কুরআন আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে — هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَ عِلْمُهُ مَعَكُمْ তিনি আরাশে আছেন এবং তাঁর জ্ঞান তাঁদের (মানুষের) সাথে আছে (তাফসীরু ইবনে আবী হাতিম বা হাওয়ালা শারহু হাদীসিন্ নুযূল লি ইবনে তাইমিয়্যাহ্ ১২৬ পৃঃ, সূত্র হাসান)।

এসব রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী মুফাস্‌সির বুকায়র ইবনু মারুফ হাসানুল হাদীস (অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত হাদীস হাসান হওয়ার যোগ্য) ইমাম নাসায়ী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন তাকে সিকাহ (বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি) বলেছেন। তার ব্যাপারে আহমাদ ইবনু হাম্বালের পক্ষ হতে মিযবীর তাহযীবুল কামালে বর্ণিত জারাহ্ সূত্র বিহীন হওয়ার কারণে প্রমাণিত নয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং ইমাম আহমাদ থেকে তাঁর তাউসীক (অনুমোদন) প্রমাণিত (দেখুন মারেফাতুল ইলাল অররেজাল ২৫০৩)।

ইবনুল মুবারকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত জারাহ্ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সাদবিয়্যাহ্ এবং আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে বাশীর আল মারূযীর কারণে প্রমাণিত নয় (দেখুন আয্‌যুয়াফা লিল উক্বায়লী ১/১৫২-১৫৩)।

আহ্‌লে সুন্নাত (আহ্‌লে হাদীসদের ইমাম) আহমাদ ইবনু হাম্বাল (هُوَ مَعَهُم اَيْنَمَا كَانُوْا) অর্থ ঃ তাঁরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (আল্লাহ্ থাঁদের সাথে আছেন।) এর বিশ্লেষণে বলেছেন عِلْمُهُ অর্থাৎ তাঁর ইলম তাঁদের সাথে আছে (শারহু হাদীসিন্নুযুল ১২৭ পৃঃ, হাম্বাল ইবনু ইসহাকের বই আস্ সুন্নাহ্ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে)।

সালাফে সলেহীনদের কেউ তাঁর বিরোধী নয়। শাইখুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়্যাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

وَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوْا هُوَ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ وَ قَدْ ذَكَرَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَ غَيْرُهُ : اَنَّ هٰذَا اِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَ لَمْ يُخَالِفْهُمْ فِيْهِ اَحَدٌ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ.

অর্থ ঃ আর সালাফ (পূর্বপুরুষদের) থেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা বলেছেন : তিনি (আল্লাহ্) জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের সাথে আছেন এবং ইবনু আব্দিল বার প্রমুখ এ মর্মে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাবেঈন (রাহেমাহুল্লাহ্) ইজমা বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি তাঁদের বিরোধিতা করেনি (শারহু হাদীসিন্নুযুল ১২৬ পৃষ্ঠা)।

একথা স্পষ্ট যে, শারঈ ইজমা হল দলীল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইমাম শাফেয়ীর বই আররিসালাহ্ এবং হাফেয ইবনু হাযম্ এর বই আল্ আহকাম।

হাফেয আব্দুল্লাহ্ মুহাদ্দিস গাযীপুরী (১২৬০ হিজরী, মৃত্যু ১৩৩৭ হিজরী) বলেন, প্রকাশ থাকে যে, আমাদের মাযহাবের আসলুল উসূল (নীতিমালার ভিত্তি) হল কেবল কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ (ইবরাউ আহলিল হাদীস অল কুরআন ৩২ পৃঃ)। স্বয়ং হাফেয সাহেব এর টীকা হিসাবে লিখেছেন এতে থেকে কেউ না মনে করে যে, আহ্‌লে হাদীসদের শারঈ ইজমা কিংবা ক্বিয়াসের প্রয়োজন নেই অথবা তারা তা অস্বীকার করে। কারণ উভয়ই (ইজমা ও ক্বিয়াস) যেহেতু কুরআন ও সুন্নাত থেকে প্রমাণিত ফলে কুরআন ও সুন্নাতকে মানলেই ইজমা ও ক্বিয়াস মানা হয়ে যাবে (ইবরাউ আহলিল হাদীস অল কুরআন ৩২ পৃঃ)।

মনে রাখতে হবে যে (مَعَكُمْ তোমাদের সঙ্গে) এর অর্থ (عِلْمُهُ وَ قُدْرَتُهُ তাঁর জ্ঞান ও তাঁর ক্ষমতা) করা তাবীল (অপব্যাখ্যা) নয় বরং তার আবিধানিক অর্থ সমূহের একটা অর্থ যেমন বলা হয়ে থাকে اِذْهَبْ أَنَا مَعَكَ যাও আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা مَعَكُمْ কে জ্ঞান ও ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোনো গুণ ভেবে বসছেন তাদের কথা সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাবেঈন (রাহেমাহুল্লাহ্) এবং তাদের পরবর্তী লোকদের ইজমার বিরোধী হওয়া কারণে প্রত্যাখ্যাত (শাহাদাত ফেব্রুয়ারী ২০০৩, ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ্ ১/৩১-৩২)।

শাইখ আব্দুল হামীদ মাদানী লিখেছেন, তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী (কুরআন ২/১৮৬)। তিনি সর্বদা বান্দার সাথে থাকেন (কুরআন ৫৭/৪, ৫৮/৭, ৯/৪০, ৮/৪৬)। তিনি নেক্কার ও ধৈর্যশীল বান্দাদের সাথে থাকেন (কুরআন ১৬/১২৮)। তবে স্ব অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং তাঁর ইলম্, সাহায্য ও তওফীক সর্বদা বান্দার সাথে থাকে। তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান সব জায়গায় আছে। তাঁর অনুগত ফিরিস্তা সকল স্থানে ছেয়ে আছেন। তাঁরা বান্দার তত্ত্বাবধানে থাকেন। আল্লাহ্‌র যিকর তথা স্মরণ থাকে বান্দার হৃদয়ে। অতঃপর তিনি টীকায় লিখেছেন ঃ যেমন যদি বলি, একা চলি রাতে, আলো নাহি হাতে, চাঁদ আছে সাথে।' এর অর্থ এই নয় যে, চাঁদ আমার সাথে আমার দেহ সংলগ্নে আছে। বরং তার জ্যোৎস্না আমার সাথে আছে। কিন্তু চাঁদ আকাশে। তেমনি মহান আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও তাওফীক বান্দার সাথে ও সকল স্থানে কিন্তু তিনি আরশে। অতএব আল্লাহ্ সাথে থাকেন —বলতে তাঁর ইল্‌ম ও তাওফীক। তাঁর অস্তিত্ব নয়। আর এটা তা'বীল (অপব্যাখ্যা) নয়। কারণ, তাঁর আরশে অবস্থান করার কথা কিতাব ও সুন্নাত হতে প্রমাণিত (তাওহীদ ১১ পৃষ্টা)।

পর্দা প্রথার সমর্থনে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান

মোঃ মোয়াজ্জেন হোসেন

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ
(٣٠) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ
اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣١)

বঙ্গানুবাদঃ (হে নাবী!) বিশ্বাসীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত (৩০)। বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগিনীপুত্র তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌন কামনা রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (৩১) (সূরা আন্ নুর)।

বিশ্ব মানবতার মাঝে যে সমাজ ব্যবস্থা কোটি কোটি বছর ধরে চলে আসছে তারই ফল আমাদের চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠে। এই মানবিক সমাজ ব্যবস্থা শুরু হয় আদম (আলাইহিস্ সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর পার্থিব জগতে অবতরণের পর থেকে। তখন থেকেই দেখতে পাই নর-নারীর সমন্বয় সাধন। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে। যেমন লজিক (তর্কবিজ্ঞান) বলে — কাজ এবং কারণ এই দুটি বস্তু একে অপরের পরিপূরক হিসাবে অবস্থান করে। কাজ ছাড়া কারণ চলতে পারে না, আবার কারণ ছাড়া কাজ ও চলতে পারে না। কোনো কাজ বা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে জেনে নিতে হবে এর পিছনে অবধারিত কোনো কারণ আছে। তেমনিভাবে নর-নারীর মাঝে অনুরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক। এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। যখন মানুষ এই নশ্বর পৃথিবীতে চলতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মাঝে ধাক্কা খেতে লাগল তখন তারা জোট বাঁধতে শুরু করল। এই জোটই হল সমাজ। আর এই সমাজকে দীর্ঘ মেয়াদীভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলে কিছু নিয়মনীতি প্রয়োজন, যখন তারা উপলব্ধি করল, তখন আল্লাহ্ তাদের মাঝে তার প্রতিফলন ঘটালেন। ঐ প্রতিফলন প্রতিবিম্ব আকার দেখা দিল। এই প্রতিবিম্বই হল প্রত্যাদেশ। আর এই প্রত্যাদেশগুলিকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'অহী'। আর এই অহী যুগে যুগে নাবী ও ও রসূলগণের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আল্লাহ্র খাস আর্মি ও মিলিটারী বিভাগীয় Commander-in-chief in Nebula অর্থাৎ মুখ্য সেনাধিপতি জীবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর মাধ্যমে পৌঁছায়। এই অহী-র বহুধা নিয়মনীতির মধ্যে মুখ্য নিয়মনীতি (Rule and Regulation) হল ৪ খানা। যথা - যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল, আল্ কুরআন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল হল আল্ কুরআন। এই আল্ কুরআন হল আধুনিক মানবের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই জীবন বিধানই সার্বজনীন

চরম ও পরম হিসাবে পরিগণিত। নর-নারীর এই মানবিক জীবনে দৃশ্যমান সমস্যা বহুল পরিস্থিতির মোকাবিলায় একমাত্র অস্ত্র হিসাবে সমাধান সূত্র গেঁথে দেয় আল্ কুরআন। এর ফলে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে উঠে। যখন এই মূল্যবোধ মানুষের চরম শত্রু শয়তানের ষড়যন্ত্রে ও কু-পরামর্শে নর-নারীর মধ্যে অশালীন পরিবেশ তরান্বিত হয় তখন সামাজিক অবক্ষয়ের রূপ নেয়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লোভনীয় বস্তু পদ, সম্পদ এবং নারী। এই ৩টির মধ্যে ১টি হল নর-নারীর অবৈধ মেলামেশা। পৃথিবীতে যতগুলি ছোট-বড়ো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সিংহভাগই হল এই অবৈধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে অবৈধ সম্ভোগ। আর এর ফলে নেমে আসে অবক্ষয়। তাই বিশ্বকে এই সামাজিক অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সামাজিক সীমারেখার ব্যবস্থা আল্লাহ্ প্রণয়ন করেন। এই সীমারেখার অপর নাম 'পর্দা' অর্থাৎ 'গোপনীয়তা'। আর এর আরবী রূপ عورت (আওরাত)।

পুরুষদের عورت (আওরাত) অর্থাৎ গোপন অঙ্গ হল কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত, আর নারীর عورت (আওরাত) অর্থাৎ গোপন অঙ্গ হল মাথার চুল থেকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বাঙ্গ শরীর। এই জন্যই তো নারীদের অপর নাম عورت (আওরাত)।

এবারে আসি মূল্যবান বস্তু কী কী? এবং কেন? তার উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় মূল্যবান সম্পদকে, অমূল্য ধন-রত্নকে চোখের আড়ালে-আবডালে রাখার প্রবণতা। কারণ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতির ভয়। কিন্তু মূল্যহীন বস্তুর কোনো বালাই থাকে না। মান-সম্মান, ভয় কিছুই থাকে না। যেমন ১০০ গ্রাম লোহার বস্তু রাস্তায় গড়াগড়ি দিলেও একটা পাগলেও স্পর্শ করবে না। কিন্তু ১০০ গ্রাম সোনা? তা কিন্তু রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি দিবে না। কেউ রাস্তায় ফেলেও রাখবে না। তার সেবা যত্ন আলাদাভাবে করবে। যদি বা কোনো কারণবশতঃ পড়েও থাকে তবে সেটাকে নিয়ে তুমুল হৈ চৈ, রৈ রৈ কাণ্ড ঘটে যাবে। এমনকী বিশাল আকারের বিবাদ-বিসম্বাদ সমাজে রূপধারণ করবে। থানা-কোর্ট-কাছারী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। খুন-খারাবী হতে কোনোরূপ দ্বিধা সংকোচ আসবে না। কেননা ১০০ গ্রাম লোহার দাম ২-৩ টাকা, আর অপরদিকে ১০০ গ্রাম সোনার দাম কয়েক লক্ষ টাকা।

আবার সামাজিক মর্যাদা-মান-সম্মানের দিক দিয়ে দেখা যায়, একজন উচ্চ পদাধিকারী আমলা হোক আর দেশের কর্ণধার হোক তাঁদের যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ VIP-র ব্যাপার তো! কিন্তু একজন মজুর শ্রেণির মানুষকে সর্বত্রই দেখা যাবে। ঐ সব আমলা বা কর্ণধারদের দেখতে গেলে বহু কাঠখড়ি, অর্থ, সময় ব্যয় করতে হবে। তবে হয়তো কোনো রকমে দেখা পাওয়া যাবে। আবার ঐ সব ব্যক্তিদের অফিসে. চেম্বারে দেখা করতে গেলে 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' দরজার সামনেই লেখা থাকবে নচেৎ পাহারাদার থাকবে। সাথে সাথে দেখা যাবে দরজায় কিংবা জানালায় মহা মূল্যবান কাঁচ কিংবা কাপড় দিয়ে পর্দা করা আছে। এগুলো কেন? মহা মূল্যের জন্যই তো, অত্যন্ত সম্মানের জন্যই তো। তাহলে এখানে বোঝা গেল, অমূল্য, মূল্যবান, অধিক সম্মান-মর্যাদার প্রতীকিকরণ হল পর্দা প্রথা।

আর এগুলোর চেয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা, অতীব মূল্যবান অমূল্য ধন করে ঐ নারী জাতীকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব প্রযুক্তিতে। আর ঐ স্রষ্টা আল্লাহ্ নারী জাতির ঐ সম্মান, মর্যাদা, মূল্য যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করলেন পর্দা পথা। কিন্তু এই নারী পর্দাহীন হয়ে পড়লে এবং অবাধ মেলামেশা করলে নিজস্ব মূল্য হারিয়ে ফেলবে। তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে কত যে বেগ পাবে তা দুর্বোধ্য। তাই নারীকে আজ দেখতে পাওয়া যায় - অবহেলার, অবমাননার পাত্রী হিসাবে।

যেমন — (১) Electron এবং Protone পাশাপাশি থাকলে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না। সাথে সাথে একে অপরের আকষর্ণে আকর্ষিত হয়ে মিশে অন্য গুণগত মানে পৌঁছায়। তাদের নিজস্ব সত্তা বিলীন হয়ে যায়। (২) আগুন এবং শুকনো খড় পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় রাখলে তৎক্ষণাৎ শুকনো খড়কে আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে নিশ্চিন্ত করে দেয়। তেমনিভাবে একজন নারী যখন নিজের গুণগত মানকে, মূল্যকে শিকেয় তুলে রেখে পুরুষদের পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় কিছু দিন চলাফেরা করে অবাধভাবে, তখন উভয়ের মধ্যে আকর্ষণীয় শক্তি এবং দাবানল জ্বলে উঠে। যার ফল স্বরূপ দেখা যায় ব্যাভিচার। আর এই ব্যাভিচারকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হয়। এই ব্যাভিচার কয়েক রকমের হয়। প্রথমতঃ মিষ্টি মিষ্টি বাক্যালাপ, দ্বিতীয়তঃ মনে মনে প্রত্যাশা, তৃতীয়তঃ চোখে চোখে সমর্থন, চতুর্থতঃ হাতে হাতে সমর্পণ, পঞ্চমতঃ যৌনাঙ্গের মিলন পর্ব। এই যৌনাঙ্গের মিলনের মধ্য দিয়ে যাতে পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ না বাধে, তাই ১ম পদক্ষেপটি রেখাপাত করা মাত্রই কিংবা তার প্রাক্ মুহূর্তেই সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এই কাজে উদ্বুদ্ধ

করতে আল্লাহ্ তাঁর বাচন ভঙ্গিতে সচেতন করে দেন। তিনি বলেন—

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا .

অর্থঃ হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বোলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর (স্বাভাবিকভাবে কথা বল) (সূরা আহযাব, আয়াত ৩২)।

নারী ও পুরুষকে আল্লাহ্ যেমন ভিন্ন প্রযুক্তিতে সৃষ্টি করেছেন তেমনি তার গন্ডি বা সীমানা ভিন্নতর করে সচেতন করেছেন। সর্বদায় মুহরিম পুরুষ ছাড়া অপর পুরুষের গন্ডির মধ্যে না গিয়ে নিজ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করা সমীচীন। তাতে আক্রান্ত হবে না, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন —

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى.

অর্থঃ তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো এবং (প্রাক্ ইসলামী) জাহেলী (অন্ধকার) যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না,..... (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)।

উপরের ৩২ নং আয়াতে 'নাবী স্ত্রীগণ'কে বলা মানে কিয়ামত পর্যন্ত সতী-সাধ্বী, সৎকর্মপরায়ণা মুসলিম নারীদেরকেও বলা হয়েছে। ঐ নারীদের সচেতন করে দিয়ে বলেন, ব্যাভিচারের প্রথম পর্যায়ভুক্ত 'মিষ্টি মিষ্টি বাক্যালাপ অর্থাৎ কোমল কণ্ঠ দ্বারা পরপুরুষের সাথে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। ৩৩ নং আয়াতে নারীদেরকে সদা-সর্বদা নিজ বাড়িতে থাকার ব্যাপারেও বললেন। সূরা নুরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো কারণবশতঃ নারীদেরকে বাইরে যেতেই হয় তবে সমস্ত শরীরকে আবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত করে যেতে হবে। নিজ বাড়িতে নারীদের অবস্থান করার ব্যাপারে ইউরোপ মহাদেশে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আসওয়াল্ড সোয়ার্জি বলেন, ''পুরুষের বুদ্ধি খোলে ঘরের বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, কলকারখানায়, রণক্ষেত্রে — আর নারীর বুদ্ধি খোলে গৃহ আঙিনায়।''

আজকে বিজ্ঞানের যুগের মানুষ হিসাবে, প্রগতির ধারক ও বাহক হিসাবে সেই বর্বরতার যুগকে, জাহেলী যুগকে, অন্ধকার যুগকে পুনরায় টেনে হিঁচড়ে আনছি কেন ? আনার বিভিন্ন রকমের অপকৌশল চালাচ্ছি কেন ? এই প্রশ্ন আজ মানবতার কাছে। মানুষের বিবেকের কাছে। ঐ অন্ধকার যুগে চতুষ্পদ জন্তুর মতো মানুষরাও যথেচ্ছ ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিত। সভ্য ও সভ্যতার যুগের মানুষ আধুনিকতার নামে অনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় নিজেরা ভেসে চলেছে যা ভোগবাদী সভ্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। যে নারীরা একদিন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, মর্যাদার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল আজকে তারা ভোগ্যপণ্য হিসাবে নিজেরাও ধরা দিচ্ছে, আর অপর দিকে ধরে নেওয়ার অপকৌশল চলছে। তাই তো ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে নারী ধর্ষণের মতো, লিভ টুগেদারের মতো, সমকামিতার মতো অবৈধ সংসর্গ। কেউ লজে, কেউ রেস্তোরায়, কেউ হাটে-বাজারে, কেউ মাঠে-ময়দানে, কেউ আনাচে-কানাচে অবৈধতার দাপট চালাচ্ছে। আর এর ফলে দেখা দিয়েছে, বিশ্বকে চমকে দিয়েছে, পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়েছে, জগতকে আতঙ্কের মাঝে ফেলে দিয়েছে এইড্সের মতো দুরারোগ্য মারণব্যাধি, ভয়াবহ ও মারাত্মক মহামারি।

নারী পুরুষের এই অবাধ অবৈধ মেলামেশার কুফল সম্পর্কে প্রখ্যাত জার্নাল দার্শনিক নীটশে বলেছেন, ''নারীকে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা অচিরেই নিস্তেজ হয়ে যাবে। ফলে এমন দিন আসবে যে, পৃথিবীতে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।''

নারী পুরুষে অবৈধ মেলামেশায় সামাজিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার যে দিকগুলি ফুটে উঠে তা বিজ্ঞানী মহল বিশেষ করে রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীগণ যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, চিরুনী তল্লাশি চালিয়ে যে সূত্র আবিষ্কার করেছেন সে সূত্রের ফর্মুলায় মিলে যাচ্ছে। এবারে সেগুলো নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

হাফেজ আজিজুল ইসলাম প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী' পুস্তকে ৪৯ নং পৃষ্ঠায় উঠে এসেছে নারী ও পুরুষের দৈহিক পরিকাঠামোয় ৩০টি পার্থক্য বিদ্যমান। তার মধ্যে ১নং পার্থক্যটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা বলে তুলে ধরে রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের ফর্মুলায় হুবহু মিলে যাওয়ার প্রেক্ষাপটটি পাঠকবৃন্দের অবগতিতে সহায়তা করছি।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

১০ই মুহার্‌রম একটি ঐতিহাসিক দিন

আব্দুর রহমান

মুহার্‌রম মাসের দশম (১০ম) দিবসকে সাধারণভাবে আশূরা বলা হয়। নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে ঐ দিনটি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে বিশ্ব ইতিহাসে উক্ত দিনটিতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের অবসান হয়। মিশরের পবিত্র ভূমিতে ফিরআউন বাদশাহ্ নাবীদের বংশধর বানী ইসরীলদেরকে পদদলিত করে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাদেরকে মজবুরী ছাড়াই কায়িক শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। তাদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করা হত। তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিভিন্ন প্রকার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতির অবনতি এতটাই ঘটেছিল যে ভবিষ্যত জাতির কাণ্ডারী নবাগত ও অনাগত শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ করা হয়েছিল। আসেল ফিরআউন নিজেকে নিজেই আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়েছিল (সূরা নাজিয়াত, আয়াত নং ২৪)।

এহেন সময়ে আল্লাহ্ সুবহানালু অ-তায়ালা মুসা (আলাইহিস্ সালাম) কে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেন। কারণ ফিরআউন সকল প্রকার কুফর্, অবাধ্যতা ও অহংকারের সীমা অতিক্রম করেছিল। মিশরের মাটিতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফিরআউনী শাসন ব্যবস্থার একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থঃ ফিরআউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল, এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল (দুর্বল) করে রেখেছিল; সে ওদের পুত্রদেরকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। কার্যতঃ সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (সূরা কাসাস, আয়াত নং ৩-৪)।

পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বলা হয়েছে, কিছু জ্যোতিষীর ভবিষ্যত বাণী ছিল যে, বানী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন একজন সন্তান জন্মলাভ করবে, যার হাতে ফিরআউন ও তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। তাই এর প্রতিবিধান কল্পে সে (ফিরআউন) পুত্র সন্তান হত্যার নির্দেশ দেয় (ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাসীর, আহসানুল বায়ান)।

পরিস্থিতির অবনতি এতই হয়ে উঠেছিল যে বানী ইসরাঈলদের ভবিষ্যত জীবন বলে কিছুই ছিল না। তাদের বংশধর ফিরআউন ও তার জাতির দাসত্ব করার এবং নির্যাতিত ও শাসিত হিসাবেই বেঁচে থাকার জন্যই যেন পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছিল। প্রতিবেশি এমন কোনো শাসক বা রাষ্ট্র ছিল না যে তাদের অত্যাচিরত ও দুর্ভাগ্যজনক জীবনে সাহায্যকারী হিসাবে তাদেরকে রক্ষা করবে। সর্বপ্রকার হতাশাজনক অবস্থা ও গাঢ় অন্ধকারে তারা যেন হাবুডুবু খাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা দেওয়া হল। ঘোষণাটি হল —

وَنُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ.

অর্থঃ যে দেশে (মিশরে) তাদেরকে হীনবল করে রাখা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে তাদেরকে নেতা ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা করলাম (সূরা ক্বাসাস, আয়াত নং ০৫)।

অতঃপর আল্লাহ্ মুসা (আলাইহিস্ সালাম) কে আদেশ করলেন —

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى

অর্থঃ (হে মূসা) আপনি ফিরআউনের নিকটে যান, সে তো সীমালংঘন করেছে এবং তাকে বলুন, তোমার কি আত্মশুদ্ধির কোনো আগ্রহ আছে? (সূরা নাজিয়াত, আয়াত নং ১৭-১৮)।

যখন মূসা (আলাইহিস্ সালাম) মিশরে দীর্ঘকাল অবস্থান করলেন এবং বিভিন্নভাবে ফিরআউন ও তার সভাসদবর্গের নিকট প্রকাশ্য দলীলসহ দাওয়াত পেশ করলেন, তথাপি তারা ঈমান আনার জন্য তৈরি হল না; বরং মূসা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু অ-তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ

পাঠালেন যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিশর থেকে প্রস্থান করুন। অবশ্য তারা আপনার পশ্চান্ধাবন করবে, তাতে ভয়ের কিছু নেই (সূরা শূয়ারা, আয়াত নং ৫২)।

সুতরাং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে নিয়ে সুখের আবাসভূমি হিসাবে পরিচিত ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করলেন। স্থলপথে মিশর থেকে ফিলিস্তিন যাবার উত্তর দিকের পথই ছিল একমাত্র পথ, যা এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকাকে মিলিত করেছে। সে পথে গমন না করে মূসা (আলাইহিস্ সালালম) পূর্বদিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন। আসলে আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা সেটাই ঘটে। সুতরাং সকাল হতেই তিনি (মূসা আলাইহিস্ সালাম) লক্ষ্য করলেন, লোহিত সাগরের তীরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ওদিকে সকাল হতেই ফিরআউন জানতে পারলো যে, বনী ইসরাঈলরা রাত্রে মিশর থেকে পলায়ন করেছে, তখন তার মর্যাদা ও ক্ষমতায় আঘাত লাগলো। তাই কাল বিলম্ব না করে সসৈন্যে ফিরআউন তাদের পিছু ধাওয়া করল। অতঃপর দৃষ্টি ফেরাতেই মূসা (আলাইহিস্ সালাম) লক্ষ্য করলেন, ফিরআউন তার সৈন্য-সামন্তসহ একেবারে তাদের নিকটেই পৌছে গেছে। সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফিরআউনের ধ্বংসাত্মক সৈন্যদের দেখে বানী ইসরাঈলরা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। নিম্নলিখিত আয়াতটি সেদিকেই ইঙ্গিত বহন করে —

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ.

অর্থাৎ ঃ আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম (সূরা শুআরা, আয়াত নং ৬১)।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির প্রতি মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর পূর্ণ আস্থা ছিল যে, নিশ্চয় তিনি আমার স্বজাতিকে আসন্ন বিপদ থেকে যেভাবেই হোক রক্ষা করবেন। অতঃপর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) নবুয়তী তরীকায় অতি ধীর স্থিরভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে বললেন — كَلَّآ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ.

অর্থঃ এটা কেমন করে সম্ভব আল্লাহ্ যখন আমারে সঙ্গে আছেন। নিশ্চয় তিনি আমাকে সঠিক পথ নির্দেশ করবেন (সূরা শুআরা, আয়াত নং ৬২)।

ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ সুবহানাহু অ-তায়ালা মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট অহী করে বললেন —

فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ .

অর্থ ঃ অতঃপর মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃস হয়ে গেল (সূরা শুআরা, আয়াত ৬৩)।

সুতরাং মূসা (আলাইহিস্ সালাম) যখন সমুদ্রে পা রাখলেন এবং তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন; আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতায় একটি শুকনো রাস্তা হয়ে গেল। সেই রাস্তা দিয়ে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন - যা ছিল ফিরআউনের সাম্রাজ্যের বাইরে। অতঃপর ফিরআউন যখন দেখলো যে - সমুদ্রে একটি শুকনো রাস্তা সৃষ্টি হয়েছে এবং বানী ইসরাঈলরা এই পথ দিয়েই অতিক্রম করেছে। তখন ফিরআউন ও তার সৈন্যসহ সেই পথ দিয়েই তাদের ঘোড়া তাড়িয়ে দিল। ভয়ংকর সমুদ্র যা কিনা কেবল বানী ইসরাঈলদের জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে সৈন্য সামন্তসহ ফিরআউনের সলিল সমাধি ঘটলো। আসলে এটি ছিল মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর একটি মুজিযা - যার সাহায্যে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর জাতি বানী ইসরাঈলরা ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তায়ালা এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করেছেন —

وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ٥ وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ٥ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ٥

অর্থ ঃ আমি অপর দলটিকে সেখানে নিমজ্জিত করলাম এবং মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে উদ্ধার করলাম। তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম (সূরা শুআরা, আয়াত ৬৪-৬৬)।

অত্র আয়াত থেকে জানা যায় যে, মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। আর ফিরআউন তার বিরাট সৈন্যদল সহ ডুবে মারা গেল। এভাবে বানী ইসরাঈলরা ফিরআউনের বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেল। এক সময় যারা হাজার হাজার বছর ধরে দাসত্ব ও পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল; সেই

দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা যে এদেশের বাদশাহ্ হতে পারে একথা কোনোদিন হয়তো কল্পনাতেও আনেনি। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ সুবহানাহু অ-তাআলা বলেন —

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ.

অর্থ ঃ এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত, তাদের আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে উত্তরাধিকারী করলাম এবং বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল। যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করে দিলাম (সূরা আরাফ, আয়াত ১৩৭)।

ফিরআউন ও তার স্বজাতির এত বড় ধ্বংস সাধন যে দিনটিতে সংঘটিত হয়েছিল — সেই দিনটি ছিল হিজরী সনরে প্রথম মাস অর্থাৎ মুহার্‌রম মাসের দশম (১০ম) তারিখ। সেই দিনটিতে বানী ইসরাঈলরা বিজয় দিবস হিসাবে পালন করত। সুতরাং উক্ত দিনটিতে তারা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে একটি সওম পালন করতো এবং আনন্দ স্ফূর্তিও করতো। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মক্কা হতে হিজরত করে যখন মদীনা গমন করেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, ইহুদীরা আশূরার সওম পালন করে। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমরা আজ কেন সওম পালন করছো?'' তারা উত্তর দিল, ''আজ অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ্ সুবহানাহু অ-তায়ালা মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এবং তাঁর উম্মতকে মুক্তি দান করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। এজন্য মূসা (আলাইহিস্ সালাম) আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এদিনে সওম পালন করতেন। সুতরাং আমরাও তাঁর অনুসরণ করে এদিনে সওম পালন করি।'' একথা শুনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর অনুগামী হবার হকদার তোমাদের অপেক্ষা আমিই অধিক।'' তারপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আশূরার সওম পালন করতেন এবং এই সওম পালনের জন্য আদেশও দিলেন (বুখারী)। অপর একটি হাদীসে এসেছে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আগামী বছর যখন আসবে তখন আমরা মুহার্‌রমের ৯ তারিখেও সওম পালন করব ইনশা-আল্লাহ্।'' অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন (মুসলিম)।

এটাই মুহার্‌রমের ইতিহাস। সিয়াম পালনের মাধ্যমেই বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মুহার্‌রম দিবস পালন করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে গড়া মহান সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে তাবেয়ী, তাবা তাবেয়ী, মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং তৎপরবর্তীকালের সকল ইমাম ও মুজতাহিদগণ সকলেই সওম পালনের মাধ্যমে মুহার্‌রম পালন করতেন। বর্তমানে এক শ্রেণির মুসলিম ভায়েরা আল্লাহ্‌র রসূলের তরীকায় অর্থাৎ সওম পালন না করে যেভাবে লাঠি, তরবারি, ঢোল, তবলা, বাঁশি এবং তাজিয়া নিয়ে মুহার্‌রম পালন করছেন ইসলামের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। মুহার্‌রমের নামে তারা যা করেন তাতে শয়তান খুশি হয় আর আল্লাহ্‌কে করা হয় অসন্তুষ্ট।

আসলে বর্তমানে যাঁরা মুহার্‌রম পালন করেন, তাঁরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কেন্দ্র করেই মুহার্‌রম পালন করে থাকেন। কারণ কাকতালীয়ভাবে ইমাম হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেদিন শহীদ হন সেই দিনটি ছিল ১০ই মুহার্‌রম। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মাতম, আহাজারি অথবা তিন দিনের বেশি শোক পালনের বিধান ইসলামে নেই। কাজেই ইমাম হোসেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাত দিবসকে কেন্দ্র করে মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে যা করছেন - তারা সরাসরি ইসলামের তথা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের বিরোধিতাই করেছেন। পরিশেষে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেদের নিকট আমার একান্ত আবেদন - **আসুন আমরা সকলে প্রচলিত নিয়মে মুহার্‌রম পালন না করে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সহীহ্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী অর্থাৎ মুহার্‌রম মাসের ৯ ও ১০ তারিখ সওম পালনের মাধ্যমে মুহার্‌রম পালন করি।**

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সমস্ত রকম শির্ক, কুফর ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন — আমীন।

যুগে যুগে মিডিয়ার মুনাফেকী ভূমিকা

এম. এ. হান্নান

মিডিয়া (Media) একটি ইংরেজি শব্দ। কোনো কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সেটাই মিডিয়া। মিডিয়ার প্রধানত দুটি স্তর রয়েছে — (১) প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্র। (২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটার, টি.ভি., রেডিও ইত্যাদি। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ক্ষেত্রে মিডিয়ার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। মিডিয়ার ধারক-বাহক ও চালক যে কাজে তাকে চালাবে সে কাজেই মিডিয়া চলবে ও ব্যবহৃত হবে। এটা প্রত্যেক নির্জীব জিনিসের ক্ষেত্রে চিরাচরিত নিয়ম।

যোগাযোগ মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু কর্মের সমষ্টি, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদান ও মত বিনিময় এমন সব উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেগুলোকে পৃথক পৃথক দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) এমন সীমিত উপকরণ, যা সীমিত ব্যক্তিকে পরস্পর মিলিয়ে দেয়। সে সব উপকরণের মধ্যে টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদির সাথে সমাবেশ, সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ এগুলো পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

(২) এমন উপকরণ, যা অগণিত ব্যক্তি পর্যন্ত কথা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। এর মধ্যে পত্র-পত্রিকা, টি.ভি, সিনেমা-ফিল্ম, টি.ভির বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আজ বিশ্ব মুসলিম উভয় প্রকার মিডিয়ার অপব্যবহারের বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আবদ্ধ ও সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশ্ব মুসলিমের আমল-আক্বীদা সমূলে ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুইজারল্যান্ডের ব্রাজিল নগরীতে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ইহুদী সাংবাদিক ড. থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে বিশ্ব ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও সুপরিকল্পিত নীলনক্সা প্রণয়ন করে। তারা সকলে একমত হয় যে, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমতঃ দুনিয়ার সকল স্বর্ণ ভাণ্ডার আয়ত্ত করতে হবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থার জাল বিস্তার করে পৃথিবীর সকল পুঁজি তাদের হস্তগত করতে হবে। এরপর তারা স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম যেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে চলে আসে এবং মিডিয়ার সাহায্যে দুনিয়াবাসীর মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া শুরু করে তারা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। সংবাদ মাধ্যম তথা সকল প্রচার মাধ্যমের অসাধারণ গুরুত্ব, প্রভাব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ড. থিওডর বলে, 'আমরা ইহুদীরা পুরো বিশ্বকে শোষণের পূর্বশর্ত হিসাবে পৃথিবীর সকল পুঁজি হস্তগত করাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। তবে প্রচার মিডিয়া আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আমাদের শত্রুদের পক্ষ হতে এমন কোনো শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হতে দেব না, যার মাধ্যমে তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রচার মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বময় এক ঝড় তোলা হয়েছে। এরা ইতিমধ্যেই দুনিয়ার মুসলিমদের দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলেছে।

একটি Moderate Islamic group and Muslim activist নামে অভিহিত। বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হল রয়টার। পৃথিবীর এমন কোনো , রেডিও সেন্টার, টিভি সেন্টার ও স্যাটেলাইট নেই যারা রয়টার থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দুটি প্রচার মাধ্যম 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা' ও প্রায় নব্বই ভাগ সংবাদ রয়টার থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিশ্বখ্যাত এ সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার ১৮১৬ সালে জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তার এই রয়টার কার্যক্রম অতি সহজেই বিশ্বময় স্থান লাভ করেছিল। এখন তো রয়টার ছাড়া পৃথিবী যেন অচল। রয়টার হচ্ছে আকাশ সংবাদ সংস্থার মহাধিরাজ।

ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল, ভারত ও মার্কিন ইহুদী লবি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। ইহুদীরা স্বীয় প্রটোকল প্রস্তুত করার পূর্বেই ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবাদ এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই এজেন্সিকে আমেরিকার পাঁচটি বড় বড় দৈনিক মিলে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' নামে প্রতিষ্ঠা করে। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ শুরু করে এবং আমেরিকায় প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকাসহ গোটা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে।

১৯৪৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উক্ত এজেন্সির সাথে আমেরিকার তেরশ দৈনিক, তিন হাজার সাত শত আটাশটি রেডিও এবং ৮৮টি টিভি স্টেশন জড়িত আছে। আমেরিকার বাইরে এগার হাজার নয় শত সাতাশ (১১৯২৭) টি দৈনিক ও রেডিও, টিভি স্টেশন জড়িত আছে। স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে দৈনন্দিন এক কোটি সতের লাখ শব্দ সম্বলিত লেখা মিডিয়াকে সরবারহ করা হয়। এছাড়া ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড প্রেস' ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস, যা ১৯৫৮ সালে একীভূত হয়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর মালিকানায় চলে আসে। এটি পরিচালিত হয় ইহুদী মালিকের অধীনে।

ইহুদী প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বময় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা আন্তর্জাতিক সুত্রগুলোকে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে মার্কিন-ইহুদী প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। যেমন —

১। পশ্চিমা গণমাধ্যম চরমপন্থা, মৌলবাদ, ধর্মীয় অনুশাসন পালনকে শব্দের ব্যবহারগত চাণক্যে সমার্থবোধক করে ফেলেছে। নিউইর্য়ক ভিত্তিক Daily Times ৪ঠা অক্টোবর ২০০২ এক সংবাদে লিখেছে "Muslims soldiers were shown performing prayers with gun." এ সংবাদের সাথে একটি ছবি ছাপা হয় এবং ছবির পরিচিতিতে লেখা হয় "Guns and Prayer go together in the fundamentalist battle". আফগানিস্তানের মুসলিমরা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বলাতের সময় স্বলাত আদায় করছে এ সত্য কথাটি পশ্চিমা মিডিয়া কৌশলে এড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর হাতে অস্ত্র থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সংবাদ প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটি যুদ্ধের চিত্র সংবাদকে সারাবিশ্বে ইসলামী মৌলবাদীদের (Islamic Fundamentalism) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করা হল। এমনিভাবে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে ইসলাম মুসলিমরা প্রতিনিয়ত বিমাতৃসুলভ আচরণের স্বীকার হচ্ছে।

২। পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যমের আরেকটি ভ্রান্তি হল মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবকাঠামো, অস্থিরতা ও ঘটনা প্রবাহকে ইসলামের সাথে একাকার করে ফেলা। ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। নব্বই-এর দশকে গালফ যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ কেবল সাদ্দামের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাঁর অমানবিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নির্বিচারে হাজারো নর-নারী সর্বস্বান্ত হওয়ার যে অভিযোগ রয়েছে তা কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মুসলিম সমর্থন করেনি। অথচ পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম সাদ্দামের এ কর্মকাণ্ডকে ইসলামের সাথে জড়িয়ে উল্লেখ করেছে 'ইসলাম কী করে এত হত্যাকে উৎসাহিত করেছে?' সাদ্দামের পরিচালিত গণহত্যাকে তারা ইসলামের সাথে তুলনা করেছে। ২০০৩ সালের মার্চ মাসের আন্তর্জাতিক আইন কানুনকে তোয়াক্কা না করে বুশ-ব্লেয়ার যখন ইরাক আক্রমণ করে তখন পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম এ আগ্রাসনকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান আক্রমণ না বলে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈতিক (?) ও বৈধ (?) আক্রমণ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। আর এ ঘটনাগুলো প্রকাশ্যই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম সারা বিশ্বে প্রচার করেছে। হিটলার খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য আমরা মনে করি না তাঁর সকল কর্মকাণ্ড খ্রিষ্ট ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঠিক এমনিভাবে আমরা মনে করি সাদ্দাম ও ইসলামকে পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম যেমন এক করে ফেলে তেমনি ইসলাম, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যকেও বিশ্ববাসীর সামনে এক করে তুলে ধরেছে। তাদের পরিবেশিত মিথ্যা ও স্থূল তথ্যের কারণে বিশ্ববাসী ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে ভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলিম দেশে সমগ্র মুসলিমদের মাত্র ১৮ শতাংশ বাস করে। সুতরাং তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে ইসলামের সাথে জড়িয়ে ফেলার কোনো কারণ থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎ ও চলচ্চিত্র হল অশ্লীলতার একমাত্র হাতিয়ার। আমাদের দেশে পশ্চিমাদের মতো কিছু উচ্চ শিক্ষিত লোক আছে যারা ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র সহকারে একত্রে স্যাটেলাইট দেখে। কোনো চলচ্চিত্রে একটি মেয়ে বস্ত্রহীন হয়ে নাচে অথবা কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করার দৃশ্য রয়েছে, এ রকম ছবি দেখাকে তারা 'ফ্রি মাইন্ড' মনে করে। অথচ এ দেশের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি করে, হালের বলদের অভাবে মানুষ কাঁধে জোয়াল টানে, সে দেশে চার্লস ডায়নার বিয়ের ছবি এবং পার্শ্ববর্তী দেশের নায়ক-নায়িকার বিয়ের খবর এক সপ্তাহ ধরে ছাপা হয়। আরেক শ্রেণির বিলাস প্রিয় মানুষ ডিস এ্যান্টিনার সাহায্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলো-ঝলমল পৃথিবীর সভ্যতা বিবর্জিত রঙ্গমঞ্চ প্রত্যক্ষ করে চলছে বিবেকহীনভাবে।

পশ্চিমের মানুষেরা নিজের বোধ-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রচার যন্ত্রের নাচের পুতুলে পরিণত হয়েছে। প্রচার যন্ত্রের প্রচারণার

নিরিখেই তারা জীবনের সবকিছু মাপতে চায়। তারা বুঝতে চায় কে কতখানি উন্নত বা অনুন্নত। প্রচার যন্ত্রই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে রেখেছে, অপশ্চিমা বিশ্বের মানুষেরা নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে পারে না। সুতরাং এদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ণে পশ্চিমের উন্নত মানুষদের সহায়তা জরুরী।

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের প্রযুক্তি শাসিত শক্তিশালী মিডিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত খেদমতগার হিসাবে ইসলামকেই এই মুহূর্তে তার বড় শত্রু হিসাবে নিশানা করেছে। কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামকে এই নিশানা করার কারণ হচ্ছে — এটি একটি সুগঠিত আদর্শ। এটি কর্পোরেট পুঁজিকে সমর্থন করে না। সমর্থন করে না বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের নামে নতুন কালের অর্থনৈতিক শোষণের দাপাদাপি। পশ্চিমের অবাধ কলজুমারিজম, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও স্বার্থপরতা ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম চায় আদল, ইহসান ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের পথের কাঁটা এই মতাদর্শকে Preemative war- এর বিজয় নিশান উড়িয়ে মার্কিন বিদ্বেষ খতম করার চেষ্টা করবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তথ্য প্রযুক্তিকে তাদের স্বার্থে Catalytic Converter- এর মতো ব্যবহার করে। এজন্য পুঁজিবাদী মিডিয়া ইসলামকে বর্বর, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী ধর্ম হিসাবে অনবরত প্রচার করে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে অবিরত নিন্দিত হতে হয়। উদ্দেশ্য, কোনো কিছুকে নিন্দিত না বানাতে পারলে তাকে ধরাশায়ী করা যাবে কেমন করে। কেবল শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতাকে আজও বৈধ করে নিচ্ছে।

আজকে ব্রিটেন, আমেরিকাসহ তাদের অন্যান্য দোসররা ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম চরমপন্থী নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বিশ্বকে তা বিশ্বাস করাতে চাইছে। প্রচারণার এই ধরণটা চিরকাল একই রকম। হয় আমাদের সঙ্গে থাকো, না হলে ভাগাড়ে গিয়ে মরো।

পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের পছন্দসই হলে টিকবে নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামী, মতাদর্শি যোদ্ধা এতে কিছু আসে যায় না। আমেরিকার জিঘাংসার বিরুদ্ধে ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়ন বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াবে, মোকাবিলা করার কথা বলবে, সেই রাতারাতি সভ্যতার শত্রু, জঙ্গী, বর্বর, সন্ত্রাসী বনে যাবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগণ আজও পাশ্চাত্যের পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপর ভয়ানকভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অবস্থানকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে। পুঁজিপতি মিডিয়াগুলোর অবিরত প্রচারণা মুসলিম জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে নৈরাজ্য উৎপাদন করে। এসবের ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। এগুলো ধীরে ধীরে ভিনদেশী ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে মিডিয়াকে ব্যবহার করা। মিডিয়ার প্রচারণাকে মিডিয়া দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। এই কৌশল আজ মুসলিমদের আয়ত্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পন্ডিত 'The biography of a prophet' এর নন্দিত রচয়িতা আর্মস্ট্রং-এর একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই, যা মিডিয়া জগতে এ কালের মুসলিমদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে একটা ধারণা দিবে। তিনি বলেন, একুশ শতকে মুসলিমরা এরকম একটা স্ট্রাটেজি ছাড়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার যুদ্ধকে মোকাবিলা করতে পারবে না। মুসলিমদের মিডিয়াকে ব্যবহার করা উচিত ইহুদীদের মতো। মুসলিমদের লবিং করতে জানতে হবে এবং তাদের একটি মুসলিম লবির সৃষ্টি করতে হবে। এটাকে আপনি সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ বলতে পারেন। এটা এমন একটা প্রচেষ্টা, এমন সংগ্রাম — যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মিডিয়াকে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে মানুষকে আপনার বুঝাতে হবে। ইসলাম রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি শক্তি। কীভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে এবং মিডিয়াকে কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা মুসলিমদের জানতে হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে এই নবতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার বিকল্প কোনো পথ নেই।

ভারতবর্ষে আর্য আগ্রাসন, ফিলিস্তিনে ইহুদী আগ্রাসন এবং আমেরিকায় ইউরোপীয় আগ্রাসনের গুণগত সাদৃশ্য প্রকট। এরা বিজিত দেশের মূল অধিবাসীদের অধীনস্থ বা নির্মূলের মধ্য দিয়ে নিজেদের আবাদ গড়েছে। অথচ প্রচারের বলে এরাই বিশ্বে ভাল মানুষ সেজেছে। অপরদিকে মুসলিমদের চিত্রিত করেছে সন্ত্রাসী, বর্বর ও অন্যান্য নানা বিশ্লেষণে। রক্তের গন্ধ আবিষ্কার করছে মুসলিমদের ইতিহাস থেকে। অথচ দু' দুটি বিশ্ব যুদ্ধ বাধিয়ে কয়েক কোটি মানুষ হত্যা করেছে তারাই। আরো কয়েক কোটিকে পঙ্গু

করেছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির মত দুটো শহরকে পরিণত করেছে সাক্ষাত ধ্বংসস্তূপে। অথচ মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় গড়ে সভ্যতার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছে। মুসলিমদের ভাণ্ডার থেকে এমনকী ইউরোপীয়রাও ফসল কম তোলেনি। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব এসেছিল বস্তুতঃ স্পেনের মুসলিমদের থেকে বিদ্যা লাভের পরেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১১ই সেপ্টেম্বর এসেছে মাত্র একবার। অথচ ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেটি ফিলিস্তিনীদের জীবনে এসেছে বহুবার। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের যত মানুষ মারা পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ মারা গেছে সাবরা ও শাতীলার ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে। গত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসের শিকার ফিলিস্তিনিদের আজ বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী এবং সেটি প্রচার জগতে আধিপত্য থাকার কারণে।

ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে সীমাবদ্ধ না হওয়ায় মিডিয়ার প্রতাপ এখন বিশ্বব্যাপী। তাদের দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিও। বিশেষ করে আজকের মেরুদণ্ডহীন মুসলিম বিশ্বের। নিউইয়র্কস্থ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসার এডওয়ার্ড সাঈদ 'Covering Islam' নামে একখানি বই লিখেছেন। এডওয়ার্ড সাঈদ একজন ফিলিস্তিনি আরব, যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর পরিচিতিও প্রচুর। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরবদের সম্পর্কে বড় আকারের ফাটল ধরে। সে ফাটলেরই মেরামতে প্রফেসর সাঈদকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট কার্টার। সেহেতু বলা যায়, মার্কিনীদের অনেক নাড়ির খবরই তার জানা। তাঁর বইতে তিনি প্রমাণ করেছেন মার্কিন প্রচার কতটা জঘন্যরূপে পক্ষপাতদুষ্ট এবং মুসলিম স্বার্থ বিরোধী। তাঁর মতে যুক্তরাষ্ট্রে ইদানিং ঝাঁকে ঝাঁকে আবির্ভূত হচ্ছে অসংখ্য মুসলিম বিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী, এদের কাজই হল মুসলিম বিশ্বে মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করা। অথবা কোনো আগ্রাসন পরিচালিত হলে সেটিকে বুদ্ধিবৃত্তিভাবে বৈধ প্রমাণ করা। অনেকেরই আফশোস, পাশ্চাত্য বিশ্ব কেন এখনও মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করছে না। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম হল, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর আগ্রাসনই বর্তমান পশ্চিমা শাসকবর্গের জন্য মডেল হওয়া উচিত। তাদের মতে ঔপনিবেশিক শাসনই বিশ্বে শেষবারের মত শান্তি (?) এনেছিল। যদিও সে শান্তি ছিল হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিরীহ ও নিঃসম্বল মানুষের সামরিক ও অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের। এশিয়া-আফ্রিকার মযলূম মানুষের স্বাধীনতাকে এ বর্বরতা বৈ ভিন্নরূপে দেখে না।

পাশ্চাত্যের শাসকবর্গ কোনো ধর্মকেই নিজেদের জন্য আজ আর হুমকি হিসাবে ভাবে না। তবে ইসলামই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যে কোনো দেশেই ইসলাম উত্থান তাদের কাছে এক নিদারুণ ত্রাস। যারাই এ উত্থানের পক্ষে তারাই তাদের কাছে সন্ত্রাসী। ইসলামের অনুসারীদের পরিকল্পিতভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে মানবতার দুশমনরূপে। এ প্রচারণায় মূল ভূমিকা পালন করছে পাশ্চাত্যের মিডিয়া। অথচ মুসলিম বিশ্বে যারা সত্যিকারের যালেম, যাদের দেশে প্রতিবাদী আওয়াজ তোলার ন্যূনতম শাস্তি হল প্রাণদণ্ড, তাদের সাথে ওদের সখ্য অতি নিবিড়। বিস্তর অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে এসব দেশের স্বৈরাচারী শাসকদেরকে টিকিয়ে রাখাই হল এদের বিদেশনীতি। এ কাজকে এরা বলে স্থিতিশীলতা। এমন স্থিতিশীলতার সাথে যেকোনো সামরিক বর্বরতা পরিচালনায় বা সমর্থনদানে এদের আপত্তি নেই। আলজেরিয়াতে এমনই (এক বর্বরতা চলছে সেদেশের স্বৈরাচারী শাসকের হাতে। অথচ পশ্চিমা মিডিয়া এ বর্বরতা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। নিশ্চুপ এরা কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে পরিচালিত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেও। তারা বর্বরতা খুঁজে ইরানে বা সুদানে। কারণ সেখানে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাসীন। নিশ্চুপ এসব দেশের একাডেমি বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও। পাশ্চাত্যের নীতি ও নৈতিকতায় কতটা মড়ক লেগেছে সেটি এ থেকেই অনুমেয়। বিবেকের যে অসুস্থতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকির কয়েক লক্ষ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করে বিজয়ের আনন্দ খুঁজেছিল, সে অসুস্থতা থেকে আজও যে তাদের আরোগ্য মেলেনি এসব তাদেরই আলামত। ইরাকে ও আফগানিস্তানে হাজার হাজার টন বোমাবর্ষণ, ইরাকের শিশু হাসপাতালে বোমাবর্ষণ, মিসাইল ছুঁড়ে ইরানের বেসামরিক বিমানের যাত্রী হত্যা — এসব নিষ্ঠুরতা সে নৈতিক অসুস্থতারই প্রমাণ। মিডিয়ার অপরাধ তারা সে নিষ্ঠুরতাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে না। তারা সুনামীতে ধ্বংস হওয়ার আগে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ দ্বীপের তুলনামূলক ছবি দেখায়। কিন্তু এ ছবি দেখায় না মার্কিনীদের বোমাবর্ষণের পূর্বে ইরাকের ফালুজা কেমন ছিল।

প্রচার মাধ্যমে ইহুদীদের আধিপত্য অতি প্রবল। রয়টারের মত বিশ্বের অন্যতম সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা তাদেরই। টাইমস্ নিউজ, উইকের মত বহুল প্রচলিত পত্রিকাগুলোর প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট তারাই। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইহুদী শিক্ষকগণই অধিকতর প্রভাবশালী। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে প্রচার মাধ্যম এসব শিক্ষকদের মতামতকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসনও নির্দেশনা নেয় তাদের থেকেই। প্রচারে ইহুদীদের প্রভাবের কারণেই ফিলিস্তিনি বসতি নির্মূলের পরও আগ্রাসী ইহুদীরা প্রচার পায় শান্তিবাদী রূপে। অথচ ইসরাঈলের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। টিকেও আছে বিরামহীন সন্ত্রাস চালিয়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুদ্ধ আর সন্ত্রাস চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিকে তারাই বিনষ্ট করেছে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, মার্কিনীদের পর তারাই এখন বিশ্বের বৃহৎ আগ্রাসী শক্তি। আর এদের সাফাই পাচ্ছে পাশ্চাত্যের মিডিয়া। মিডিয়ার হাতে যিম্মী পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতিকেরাও, ইসরাঈলী স্বার্থের বিরোধিতা দূরে থাক, তাদের স্বার্থে সামান্য নিরবতা ও তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। মিডিয়ার আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞকে তারা একটি ন্যায্য যুদ্ধ রূপে বিশ্বময় প্রচার করেছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে সেটি গ্রহণযোগ্যতাও পাচ্ছে। মিডিয়া যে কিভাবে মানুষের মনের ভুবনে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এ হল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এককালে বহু অর্থ ও বিপুল রক্তক্ষয়ে প্রকাণ্ড এক সামরিক যুদ্ধ লড়েও এমনটি সম্ভব ছিল না। আগ্রাসী শক্তিরূপে এটিই হল মিডিয়ার ক্ষমতা। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজ সে শক্তির কাছেই প্রচণ্ডভাবে পরাজিত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে অপপ্রচারে অনেক মিডিয়া লিপ্ত আছে। তন্মধ্যে ২০০টি রেডিও স্টেশন, ১৭০০টি টিভি চ্যানেল এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য প্রায় ২২ হাজার ম্যাগাজিন প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

মূলতঃ দ্বীনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলেম-ওলামা মিডিয়াতে অংশ গ্রহণ না করায় নাস্তিকবাদীরা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে ইসলামের নাম-নিশানা চিরতরে উড়িয়ে দিতে মিডিয়ার অপব্যবহারের মাতাল হয়ে লেগেছে। ইসলামে চিরনিষিদ্ধ অপকর্মগুলোকে মিডিয়াতে ব্যাপকহারে অতি জোরালো ভাবে সম্প্রচার করা হয়। মিডিয়ায় প্রচারিত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করলে অনায়াসেই অনুমেয় হয় যে, এটার প্রচারক কে বা কারা? বর্তমানে মিডিয়াতে অতি গুরুত্বের সাথে ইহুদী, খ্রিস্টানদের চাল-চলন, বেশ-ভূষণ, কাজ-কর্ম সম্প্রচার করা হয়। মিডিয়ায় প্রচারিত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করে আমাদের মুসলিম দেশের মানুষেরা নাস্তিক ও লম্পটদের সংস্কৃতি ও উলঙ্গপনাকে পছন্দসই মনে করছে। ইসলামী সংস্কৃতির চেয়ে তথাকথিত উলঙ্গপনার সংস্কৃতিকে মুসলিমদের মুষ্টিমেয় ছেলে-মেয়েরাই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে এড়িয়ে চলছে।

এ মিডিয়ার যুগে যদি সঠিকভাবে ইসলাম প্রচার করা হয়, মিডিয়ার প্রতিটি সেক্টরে যদি ইসলামের বিধি-বিধান থাকে তাহলে ইসলামের যে কত বড় একটা খেদমত তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি মুম্বাই-এর ডা. যাকির নায়েক ইসলামী মিডিয়া অঙ্গনে বড় আকারে আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি মিডিয়া ব্যবহার করে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। তার পরিচালিত পীস টিভি' বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করছে। তিনি বিধর্মীদের সাথে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। তার প্রতি সেমিনারে হাজার হাজার জনতা অংশ গ্রহণ করছেন। তিনি এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন শুধুমাত্র মিডিয়া চ্যানেল ও ইন্টারনেটে অংশ গ্রহণের কারণে। তাছাড়া তার লেকচার বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় এবং তার কথাগুলোও বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ। তাই যুগের পরিবর্তনে, সময়ের দাবীতে, ইসলামের খাতিরে ইন্টারনেট ও টিভি চ্যানেলসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় হক্বপন্থী আলেমদের শক্ত অবস্থান একান্ত আবশ্যক।

আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষ শান্তির বার্তা খোঁজা-খুঁজি করছে। যারা বুঝেছে শান্তির ছায়া একমাত্র ইসলামেই, তারা এখন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানদানকারী ব্যক্তিকে তালাশ করছে। ইসলাম জানতে তারা হা করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মিডিয়াতে হক্বপন্থী জ্ঞানী লোকের স্বল্পতা চরম পর্যায়ে। তাই অতি শীঘ্রই এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। কোন জায়গায় কীভাবে মিডিয়াকে অপব্যবহার করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করে মিডিয়ার মাধ্যমেই বাতিল শক্তির মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবিলায় মিডিয়াকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া আয়ত্তে এনে তাতে ইসলাম প্রচারের সুগম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের যুগ। তাই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়ার ঘটনার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। আর এ খবর যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তা হল এই আধুনিক নিউজ মিডিয়া। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি সহ বিশ্বের প্রধান নিউজ মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষীদের করায়ত্তে। এ কারণে প্রতিদিন ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সংবাদ

প্রচার, কুৎসা রটনা ও বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সহজ সরল মানুষদেরকে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে সন্দেহপ্রবণ মানুষকে ইসলামপন্থীদের পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন পন্থায় নিউজ মিডিয়ার যুগে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নিউজ মিডিয়া সৃষ্টি করলে একবিংশ শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীতে পরিণত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

এ সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১। মুসলিম বিশ্বের জনবলকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

২। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে গণমাধ্যম ও তথ্য প্রবাহের অবস্থা খুবই করুণ। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য গণমাধ্যম বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে হবে।

৩। তথ্য ও প্রযুক্তিতে মুসলিম বিশ্ব অনেকটাই পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ হল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না থাকা। ইসলামী বিশ্ব এক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে, এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ব এ পরিবারের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

৪। OIC (Organization of Islamic Conference) কর্তৃক ১৯৭৯ সালে সউদী আরবের জেদ্দায় IINA (International Islamic News Agency) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। এটাকে সত্যিকার অর্থে রয়টার বা সি.এন.এন. বা আল-জাযীরা-এর ন্যায় সংবাদ সংস্থা হিসাবে গড়ার কার্যকরী পদক্ষেপও আইসিকেই নিতে হবে।

৫। মুসলিম বিশ্বের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর ও সুনিবিড় করার লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা বিধর্মীদের নিউজ মিডিয়ার বিরুদ্ধে তিনি আমদেরকে শক্তিশালী নিউজ মিডিয়া গড়ে তুলে বিশ্বের মানুষের মন থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দূর করার তাওফীক দান করুন — আমীন।

৪র্থ পর্ব

অযূতে ঘাড় মাসাহ্ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত

আহমাদুল্লাহ্

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাওকুফ বর্ণনাসমূহ

ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে হাতে গোনা কিছু মাওকুফ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় যেগুলির তাহক্বীক্ব নিম্নরূপ —

দলীল -১ : ইবনে হাজার আসক্বালানী রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন,

رَوَاهُ أَبُـو عُبَيْدٍ فِى كِتَابِ الطُّهُوْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْـدِيٍّ عَـنْ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : " مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِىَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

আবূ ওবায়দ এটি কিতাবুত তুহূরে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদী হতে, তিনি মাসঊদী হতে, তিনি কাসেম বিন আব্দুর রহমান হতে, তিনি মূসা বিন ত্বালহা হতে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মাথার সাথে গর্দান মাসাহ্ করবে, ক্বিয়ামতের দিনে তাকে বেড়ী পরানো হতে মুক্ত রাখা হবে (ক্বাসেম বিন সাল্লাম, আত-তুহূর হা/৩৬৮; আত-তালখীসুল হাবীর হা/৯৭; নবীজির নামায পৃঃ ১১৪, ১১৫, সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব, পরিবেশক : মুমতায লাইব্রেরী; মুফতী গোলামুর রহমান, সলাতুন নবী স. পৃঃ ১০৩)।

পর্যালোচনা : এটি মুরসাল রেওয়ায়াত। যা যঈফ এবং দলীলের অনুপযুক্ত নিম্নোক্ত কারণে —

১। ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ নিজেই একে মুরসাল বলেছেন (ঐ)।

২। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন —

وقد فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول بل شئل كثير منهم عن مشايخهم، فذكروهم كقول أبى حنيفة : "ما رأيت من جابر الجعفى وحديثه عنه موجود. " و قول الشعبى : " حدثنى الحارث الأعور و كان كذابا وحديثه عنه موجود."

আমি অসংখ্য মুরসাল বর্ণনা অনুসন্ধান করেছি। তারপর যেগুলি গায়ের আদেল (ন্যায়-পরায়ণ নন) হতে পেয়েছি। বরং তাদেরকে তাদের উস্তাদসমূহের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তারা তাদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যেমন আবূ হানীফার উক্তি — আমি জাবেরুল জুফীর চাইতে বড় মিথ্যুক আর দেখিনি। তার থেকে বর্ণিত হাদীসও বিদ্যমান আছে এবং শা'বীর উক্তি — হারেস আওয়ার আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মহা মিথ্যুক ছিলেন। তদুপরি তার হাদীস বিদ্যমান আছে (আন-নুকাত ২/৫৫০)।

৩। ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

وَ الْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِىْ أَصْلِ قَوْلِنَا، وَ قَوْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

আমাদের মৌলিক কথা এবং হাদীস বিশারদদের উক্তি হল, মুরসাল বর্ণনা দলীল নয় (মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১/২৯)।

৪। ইমাম তিরমিযী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

و الْحَدِيْث اِذَا كَانَ مُرْسلا فَاِنَّهُ لَا يَصح عِنْد أَكْثر أَهل الحَدِيْث قد ضعفه غير وَاحِد مِنْهُم.

আর হাদীস যখন মুরসলা হবে তখন অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তা (তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা) শুদ্ধ হবে না। নিশ্চয়ই মুরসাল বর্ণনাকে একাধিক মুহাদ্দিস যঈফ বলেছেন (আল্ ইলালুস সগীর পৃঃ ৭৫৩)।

৬। হাফেয ইরাক্বী রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন,

وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ .... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِى الاسْنَادِ

জমহুর মুহাদ্দিসগণ একে (মুরসাল বর্ণনাকে) বাতিল বলেছেন।...... সনদের মধ্যে রাবীর পতিত হওয়ার বিষয়টি অজ্ঞাত থাকার কারণে (ফাৎহুল মুগীস, ক্রমিক ১২৩)। অর্থাৎ মুরসাল বর্ণনাতে কোন্ রাবী বাদ পড়ে গিয়েছেন তা অজানা থাকার কারণে একে যঈফ হিসাবে গণ্য করা হয়।

৭। যায়নুদ্দীন আ-ইরাক্বী বলেন,

و ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو المذهب الذى استقر عليه أراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الاثر.

মুরসাল বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করার বিষয়টি বর্জিত হওয়া এবং তার যঈফ হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। এটিই সেই মাযহাব যার পক্ষে জমহুর হাদীসের হাফেয এবং হাদীসের সমালোচক মুহাদ্দিসগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন (আত্ তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ্ পৃঃ ৭৩)।

৮। খতীব বাগদাদী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন,

وَ عَلَى ذَلِكَ اَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ وَنُقَّادِ الْأَثَرِ.

আর এর পক্ষেই অধিকাংশ হাদীসের হাফেয এবং হাদীসের সমালোচকগণ রয়েছেন (আল্ কিফায়াহ্ পৃঃ ৩৮৪)।

৯। ইমাম নববী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন,

ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ الشَّافِعِيِّ وَ كَثِيْرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَ أَصْحَابِ الْأُصُوْلِ.

অতঃপর মুরসাল হাদীস অধিকাংশ মুহাদ্দিস, শাফেঈ, অধিকাংশ ফক্বীহ ও আসাহবুল উসূলদের নিকটে যঈফ (তাদরীবুর রাবী শরহে তাক্বরীবুন নববী ১/২২২)।

১০। ইমাম আবূ দাউদ রাহেমাহুল্লাহ লিখেছেন,

فَاِذَا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل وَ لم يُوْجد الْمسند فالمرسل يحتَج بِهِ وَ لَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِى الْقُوَّة.

আর যখন মুরসাল ব্যতীত কোনো মুসনাদ বর্ণনা থাকবে না এবং কোনো মুসনাদ পাওয়া না যায় তখন মুরসাল দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে। আর এটি মুত্তাসিল-এর ন্যায় শক্তিশালী নয় (রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ্ পৃঃ ৩৫)।

'দলীল সহ নামাযের মাসায়েল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন —

وَ أما الْمَرَاسِيل فقد كان يحتج بها الْعلماء فيما مضى مثل الثَّوْرِىّ وَ مَالك بن أنس و الْأَوْزَاعِىّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِى فَتكلم فيها.

অর্থাৎ মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন পূর্বেকার আলেমগণ, যেমন, সুফিয়ান সাওরী, মালেক ও আওযায়ী। অবশেষে শাফেঈ এসে এতে আপত্তি করেছেন (পৃঃ ৪১৬)।

এখানে ইমাম আবূ দাউদের উক্তির বাকি অংশ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেছেন —

وَ تَابعه على ذَلِك أَحمد بن حَنْبَل وَ غَيره رضوَان الله عَلَيْهِم.

আর তাকে আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যরা অনুসরণ করেছেন (রিসালাতু আবী দাউদ ইলা মাক্কাহ্ পৃঃ ৩৪)। সবশেষে ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন,

فاذا لم يكن مسند غير المراسيل و لم يوجد المسند فالمرسل يحتج به و ليس هو مثل المتصل فى الْقُوَّة.

আর যখন মুরসাল ব্যতীত কোনো মুসনাদ বর্ণনা না থাকে এবং কোনো মুসনাদ পাওয়া না যায় তখন মুরসাল দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে। আর এটি মুত্তাসিল-এর ন্যায় শক্তিশালী নয় (রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ্ পৃঃ ৩৫)।

অর্থাৎ ইমাম আবূ দাউদ শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলেছেন। নিঃশর্তভাবে মুরসাল রেওয়ায়াত গ্রহণ করার কোনো ভিত্তি নেই। আর সাহাবীগণও নিরীক্ষা করে হাদীস গ্রহণ করতেন। এমনকী এক সাহাবী আরেক সাহাবীর কথাকেও যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করতেন। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

তাক্বলীদপন্থীদের দাবী অনুসারে চার মাযহাবই সঠিক। সুতরাং যদি ইমাম শাফেঈ বা ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কোনো একজন ইমাম মুরসাল রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করা বেঠিক মনে করেন তবে তা তাক্বলীদপন্থীদের নিকটে সঠিক অভিমত হিসাবে গণ্য হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

১১। মুরসলা রেওয়ায়াত সম্পর্কে বাংলাভাষী হকপিপাসু ভাই-বোনদের অত্যন্ত প্রিয় মাসিক পত্রিকা 'আত্ তাহরীক' প্রদত্ত ফতওয়া নিম্নরূপ —

যে হাদীস কোনো তাবেঈ মধ্যবর্তী রাবীর নাম না করে সরাসরি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীস বলে। 'মুরসাল' হাদীস যঈফ হাদীসের শ্রেণিভুক্ত। এজন্য জমহুর মুহাদ্দেসীনের নিকেট মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় (তাদরীবুর রাবী ১/১৯৮)। তবে শর্তসাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যেমন ইমাম শাফেঈ সহ অপরাপর ইমামগণ উল্লেখ করেছেন — (১) রাবী উঁচু স্তরের তাবেঈ হওয়া। (২) রাবী যে রাবীর কাছ থেকে ইরসালটি করেছেন তাঁকে 'সিক্বাহ' বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করা। (৩) বিশ্বস্ত অন্য কোনো রাবীর বিরোধিতা না থাকা এবং (৪) নিম্নোক্ত চারটি শর্তের যে কোনো একটি থাকা যেমন (ক) অন্য কোনো মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (খ) অপর কোনো মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (গ) সাহাবীর কওল দ্বারা সমর্থিত হওয়া। অথবা (ঘ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতামতের অনুকূলে হওয়া। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মুরসাল হাদীস দলীল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে (আল্ মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ৬/২০৬, তায়সীরু মুসত্বলাহিল হাদীস পৃঃ ৬০, বিঃ দ্রঃ মাসিক আত্ তাহরীক পৃঃ ৮০, এপ্রিল ২০১৫)।

১২। ইবনে খুযায়মান রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

لَا نَحْتَجُّ بِالْمَرَاسِيْلِ وَ لَا بِالْأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ، وَ لَا نَحْتَجُّ أَيْضًا فِىْ صِفَاتِ مَعْبُوْدِنَا بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَايِيْسِ.

আমরা না মুরসাল দ্বারা দলীল পেশ করি আর না দুর্বল হাদীসসমূহ দ্বারা। আমরা আমাদের মাবূদের সিফাতসমূহ-এর ক্ষেত্রে রায় এবং ক্বিয়াসের দ্বারাও দলীল পেশ করি না (আত্ তাওহীদ ১/১৩৬)।

(মুরসাল রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা প্রকাশিতব্য — লেখক)।

মোটকথা, মুরসাল রেওয়ায়াত শর্তহীনভাবে দলীলযোগ্য নয়। কেননা এতে রাবী মাজহুল থেকে যান এবং এর সনদে রাবীর বিচ্ছিন্নতা রয়ে যায়। যদি মুরসাল বর্ণনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) বা মুতাবাআত (সমর্থনসূচক বর্ণনা) বিদ্যমান থাকে তাহলে তা দলীলের যোগ্য হতে পারে।

এই বর্ণনার রাবী 'মাসঊদী' সম্পর্কে বিদ্বানগণের বক্তব্য নিম্নরূপ—

১। ইবনে সাদ বলেছেন —

المسعودى واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود. مات ببغداد. و كان ثقة كثير الحديث الا أنه اختلط فى أخر عمره.

আল্ মাসঊদীর নাম হল আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ। তিনি বাগদাদে মারা গিয়েছেন। তিনি সিক্বাহ, অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তবে শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন (আত্ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, রাবী নং ২৬২০)।

(রাবীর হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাদীসকে সঠিকভাবে মনে রাখতে না পারায় হাদীসের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে ইখতিলাত্ব বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখলিলাত হতে পারে। যেমন বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক পুড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদেও ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি (দ্রঃ তায়সীরুল মুসত্বলাহিল হাদীস পৃঃ ১২৫) — লেখক।)

২। ইমাম ইজলী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. " الكوفى " ، ثقة، الا أنه تغير بآخرة.

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ কুফার অধিবাসী, সিক্বাহ্ রাবী। তবে শেষ জীবনে (তার স্মৃতি শক্তি) পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল (আস্ সিক্বাত, রাবী নং ৯৬২)।

৩। খত্বীব বাগদাদী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

محمد بن سعد قال : المسعودى اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلى، مات ببغداد، و كان ثقة كثير الحديث الا أنه اختلط فى آخر عمره، زاد الأزهرى ورواية المتقدمين عنه صحيحة.

মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেছেন, মাসঊদীর নাম হল আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ হুযালী। তিনি বাগদাদে মারা গিয়েছেন এবং তিনি সিক্বাহ, অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তবে শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন। আযহারী আরা বলেছেন, তার থেকে পূর্ববর্তীদের (পুরাতন ছাত্রদের) বর্ণনা বিশুদ্ধ (তারীখে বাগদাদ ১০/২২০)।

৪। ইবনুল জাওযী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

قَالَ الُعقيلِىُّ تغير فى آخر عمره فى حديثه اضطراب.

উক্বায়লী বলেছেন, তার শেষ জীবনে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তার হাদীসে অসংগতি রয়েছে। তিনি তাকে যঈফ এবং মাতরূক রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আয্ যুআফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ১৮৮১)।

৫। হাফেয যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

قَالَ ابُن نمير ثِقَة اخُتَلَط بِآخِرِه وَ قَالَ ابُن حبَان كَانَ صَدُوقًا اِلَّا أَنه اخُتَلَط فِى آخر عمره وَ قَالَ آخر كَانَ حسن الحَدِيُث.

ইবনে নুমায়ের বলেছেন, তিনি সিক্বাহ্। তার শেষ জীবনে ইখতিলাত্ব হয়েছিল এবং ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তবে তার শেষ বয়সে তিনি ইখতিলাত্বে পতিত হয়েছিলেন এবং অন্যরা বলেছেন, তিনি হাসানুল হাদীস ছিলেন (আল্ মুগনী, রাবী নং ৩৫৯০, সনদবিহীন)। তিনি তার প্রশংসা করার সাথে সাথে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বলিত উক্তিগুলিও উপস্থাপন করেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ৪০, আর রিসালাহ্)।

৬। হাফেয আলাঈ রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে মুখতালিত্বদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আল মুখতালিত্বীন, রাবী নং ২৮)।

৭। আস্ সাফাদী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

عبد الرَّحُمَن بن عبد الله بن عتبَة بن عبد الله بن

مَسْعُود الْهُذَلِي الْمَسْعُوْدِيّ الْكُوفِي أحد الْأَعْلَام قَالَ أَبُو حَاتِم تغير قبل مَوته بِيَسِير سنة أَو سنتَيْن وَكَانَ أعلم أهل زَمَانه بِحَدِيْث ابْن مَسْعُود.

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ হুযালী আল্ মাসউদী কুফার অধিবাসী অন্যতম আলেম। আবূ হাতেম বলেছেন, তার মরণের এক বা দু'বছর আগে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার যামানায় ইবনে মাসঊদ হতে হাদীস বর্ণনায় সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন (আল্ ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত ১৮/৯৬)।

৮। হাফেয বুরহানুদ্দীন রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে 'মুখতালিত্বীনদের' মাঝে উল্লেখ করেছেন (আল ইগতিবাত্ব, রাবী নং ৬২)।

মোদ্দাকথা, তিনি আস্থাভাজন রাবী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। ফলে তিনি যঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

সতর্কীকরণ ঃ সলাতুন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর লেখক দাবী করেছেন যে, ইবনে মাহদী 'মাসঊদী'র ইখতিলাত্বের পূর্বেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দলীল হিসাবে ইবনে হাজার আসক্বালানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পৃঃ ১০৪)। মূলত ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ স্বীয় 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে সেটি সনদবিহীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয় (দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৩০, আরবী পাঠ عبد الله بن مهدى فلم يسأله عن شيء.)। যদি উক্তিটির কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ থেকে থাকে, তবে তা আরবী ইবারত সহ উপস্থাপন করার জন্য মুহতারাম লেখক সাহেবকে বিনীত অনুরোধ জানাই।

অতঃপর তিনি আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন যেটি দু'টি কারণে যঈফ। সনদটি হল —

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(কিতাবুত তুহূর হা/৩৬৯)।

এটি দুটি কারণে যঈফ। (১) এখানে উপরোল্লিখিত মাসঊদী আছেন যিনি যঈফ। (২) এখানে হাজ্জাজ নামী রাবী রয়েছেন। তিনি যদি 'হাজ্জাজ বিন আরতাত্ব' হয়ে থাকেন তবে তিনি যঈফ। কেননা তিনি মুদাল্লিস রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন (ইবনে হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ১১৮; নাসাঈ, যিকরুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ১২; বুরহানুদ্দীন হালাবী, আত-তাবাঈন, রাবী নং ১১; ইবনুল ইরাক্বী, আল্ মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৮)। যেহেতু মাসঊদীর ছাত্রদের মধ্যে হাজ্জাজ নামী কোনো ছাত্রকে পাইনি তাই ইনি কোন্ হাজ্জাজ তা স্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছেন না। যদি এই রাবী 'হাজ্জাজ বিন আরতাত্ব' না হয়ে অন্য কেউ হন, তবে লেখককে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন তার পূর্ণ জীবনী জারহ এবং তাদীল সহ উল্লেখ করেন। সাথে সাথে এটিও প্রমাণ করতে হবে যে, এই হাজ্জাজ মাসঊদীর মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বেই তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

সলাতুন নাবী (সঃ) গ্রন্থের লেখক মুফতী গোলামুর রহমান ঘাড় মসাহ্ করার স্বপক্ষে বুখারীর (হা/১৮৫) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মধ্যে বলা হয়েছে, ''অতঃপর দু হাত দিয়ে মাথা মাসাহ্ করলেন। অর্থাৎ হাত দুটি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত (মাথার) পেছনের চুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিলেন। এরপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে নিলেন'' (বুখারী হা/১৮৫, ১/১০৭, ১০৮, তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।

এই হাদীসের দ্বারা গর্দান মাসাহ্র দলীল খোঁজা হাস্যকর। ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ্ এই হাদীস দিয়ে গর্দান মাসাহ্র দলীল গ্রহণ করেছেন বলেও প্রমাণ নেই। বুখারীর শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, ''হাতকে (মাথার) সম্মুখভাগে এবং পেছনের ভাগে অগ্রসর করানোর হিকমত হল, মাথার উভয় দিককে পূর্ণাঙ্গভাবে মাসাহ্ করা'' (ফাৎহুল বারী হা/১৮৫, ১/২৯৩, তাহক্বীক, তাখরীজ ও তারক্বীম : আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায, ফুয়াদ আব্দুল বাকী এবং মুহিব্বুদীন খত্বীব, দারুল মারেফাহ্)। যদি এর দ্বারা ঘাড় মাসাহ্র আমলকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত, তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ পূর্বেই তা উল্লেখ করে যেতেন। বলাবাহুল্য, মুক্বাল্লিদ স্বীয় ইমামের নিকট থেকে মাসআলা বুঝিয়ে নিবেন। নিজের মুজতাহিদ, মুক্বাল্লাদ ইমামকে বর্জন নিজের ত্রুটিযুক্ত ইজতিহাদ দ্বারা ফতওয়া প্রদান করা কোনো মুক্বাল্লিদ ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয় (যার তাক্বলীদ করা হয় তাকে মুক্বাল্লাদ বলা হয়। যিনি তাক্বলীদ করেন তাকে মুকাল্লিদ বলে)।

মুফতী হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত (আল্ ফাতাওয়া আল হিনদিইয়া ৩/৩০৮)। এটি প্রমাণিত সত্য যে, দেওবন্দীদের মাঝে কোনো মুজতাহিদ নেই। সুতরাং তাদের নামের আগে মুফতী লাগানোও অযৌক্তিক।

বিস্তারিত দেখুন ঃ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) রচিত নূরুল আইনাইন পৃঃ ৫৩৭।

২য় পর্ব

স্বহীহ্ মুসলিমের ভূমিকা এবং সালাফী অনুপ্রেরণা

আব্দুর রাকীব মাদানী

৫। শরীয়তের জ্ঞান কিতাব ও সুন্নাতে বিদ্যমান, গোপন বা বাতেনী জ্ঞান বলে কিছু নেই : পীর-ফকীর, সূফী সম্প্রদায়ের একটি দাবী হচ্ছে, তাদের পীর-অলীদের নিকট নাকি গোপন এলেম-জ্ঞান রয়েছে যা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট নেই। তারা কুরআন সুন্নাতের জ্ঞানকে যাহিরি জ্ঞান বা শরীয়তী জ্ঞান বা কিতাবি জ্ঞান মনে করে আর তাদের পীরদের নিকট বিদ্যমান সেই রহস্যময় কল্পিত জ্ঞানকে বাতেনী জ্ঞান বা মারেফতী জ্ঞান কিংবা ভেদে মারফতের জ্ঞান বলে থাকে। সেই জ্ঞান নাকি ৭০ শতাংশ। আর কুরআন সুন্নাহ এবং এই দুই মূল উৎস থেকে উৎপন্ন জ্ঞান নাকি কেবল ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ ইসলামের ১০০ শতাংশ ইলমের মধ্যে তাদের সেই গোপন এলেম হচ্ছে ৭০ শতাংশ আর বাকি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, আক্বীদা ইত্যাদি মিলে মাত্র ৩০ শতাংশ।

যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, ইলমের এত বড় ভাণ্ডার তাদের কে দিয়েছেন এবং এটা তারা কিভাবে পেয়েছে? অর্থাৎ সেই গোপন জ্ঞানের সূত্র কী? তাহলে তারা বলে : এই জ্ঞান নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খাস করে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দিয়েছিলেন আর তিনি তা হাসান বাস্বরীকে দিয়েছিলেন আর তাঁর থেকে সূফী মাশাইখগণ সিনা বসিনা পরম্পরাগতভাবে পেয়েছেন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকরূপে হাসান বাস্বরীর বক্ষ থেকে পীর-বুযুর্গদের বক্ষে ট্রান্সফার হয়েছে।

সূফীদের এই দাবীর খণ্ডন স্বহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ হয়েছে, কাতাদাহ্ (রাহেঃ) আবূ দাঊদ আল আ'মা নামক জনৈক রাবীর একটি বিশেষ দাবীর খণ্ডনকালে বলেছেন :

فو الله ما حدثـنا الحسن عن بدرى مشافهة.

অর্থ : আল্লাহ্‌র কসম! হাসান (বাস্বরী) কোনো বদরী সাহাবী হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেননি। কাতাদাহ (রাহেমাহুল্লাহ্) এর এই উক্তি একটি স্পষ্ট উক্তি যে, হাসান বাস্বরী (রাহেমাহুল্লাহ্) কোনো বদরী সাহাবী হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেননি; অথচ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাই সূফী পীরদের বাতেনী গোপন জ্ঞান ভাণ্ডারের সূত্র একটি মিথ্যা সূত্র এবং তাদের সেই জ্ঞানের সূত্রের দাবীও মিথ্যা দাবী। ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাদের সেই বাতেনী মারেফতী ইলম ভাণ্ডার কোনো শারঈ ইলম নয় এবং তা মানা বিশ্বাস করাও ভণ্ডতা ভ্রষ্টতা, যা নিছক একটি কল্পিত ভূয়া মানব রচিত মিথ্যা রহস্যকর জ্ঞানের ধারণা ও প্রতারণা।

উল্লেখ্য এই গোপন বাতেনী জ্ঞানের দাবী শিয়ারাও করে থাকে। তারা বলে থাকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র অস্বী বা তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক অসিয়তকৃত। আর তার নিকট রয়েছে বিশেষ জ্ঞান যা অন্য কারো কাছে নেই। আর সেই জ্ঞান তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর সন্তান হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে। অতঃপর তাঁদের থেকে ট্রান্সফার হয়েছে শিয়াদের বারো ইমামদের বক্ষে। সূফীদের বাতেনী জ্ঞান আর শিয়াদের অসিয়তকৃত জ্ঞানের মাঝে মিল লক্ষণীয়।

৬। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে মুসলিমদের আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ্‌আহ নামকরণ বৈধ : বর্তমানে যুগে এমন কিছু মুসলিম ভাই আছেন যারা মনে করেন যে, মুসলিমকে হানাফী, শাফেঈ, সালাফী, আহলুল হাদীস ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। যাঁরা এমন পরিচয় দেয় তাদের তারা খুবই মন্দ মনে করেন। এমন সংশয়ের উত্তরও সহীহ্ মুসলিমের ভূমিকায় রয়েছে। ইমাম মুসলিম তাবেঈ ইবনু সীরীনের বরাতে উল্লেখ করেছেন —

لَـمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَـمَّا وَقَعَتِ الْفِتْـنَـةُ، قَـالُـوا : سَـمُّـوا لَـنَـا رِجَـالَـكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّـةِ فَيُـوخَـذُ حَـدِيثُـهُـمْ ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

ইতিপূর্বে লোকেরা হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

করত না কিন্তু যখন ফিতনা প্রকাশ পেল, তখন তারা বলল, তোমরা তোমাদের হাদীসের সূত্রের বর্ণনা দাও (কার থেকে শুনেছো) অতঃপর দেখা হতো, বর্ণনাকারী যদি আহলুস সুন্নার অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে তার হাদীস নেওয়া হতো। আর যদি সে বিদআতপন্থী হতো, তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হতো না (ভূমিকা সহীহ্ মুসলিম ১/৪৪)।

এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, তাবেঈনদের যুগে এবং হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি নাম আবির্ভূত হয়; একটি আহলুস সুন্নাহ্ বা সুন্নাহ্র অনুসারী অন্যটি আহলুল বিদ্আহ বা বিদআতপন্থী। যে সময় বড় বড় তাবেঈ তথা সাহাবাগণের সন্তান জীবিত এবং মুহাদ্দেসীনদের একটি বিশাল জামাআত সহ ফুকাহায়ে কেরামের সুযোগ্য দল বিদ্যমান, তারা মুসলিম জামাআতের উপরোক্ত দুটি নাম হওয়ায় কি আপত্তি তুলেছিলেন, উম্মতকে সর্তক করেছিলেন বা এ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, মুসলিমদের কেবল একটিই নাম হবে আর তা হচ্ছে মুসলেমূন বা মুসলিম? আহ্লুস সুন্নাহ এবং আহলুল বিদআহ বলা যাবে না? তাই খাঁটি মুসলিমদের দলে ভেজাল মুসলিম অবস্থান করে এবং ইসলামের নামে এমন কাজ-কর্ম এবং বিশ্বাস রাখে যা ইসলাম বহির্ভূত, এমন সময় তাদের ভিন্ন নামকরণ করা শুধু বৈধই নয় বরং জরূরী যেন আসল হতে নকলের তফাৎ হয়, খাঁটি এবং ভেজালের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

৭। হাদীস বর্ণনাকারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় : ইমাম মুসলিম (রাহেঃ) বলেন : আমাকে আমর বিন আলী ও হাসান আল হুলোয়ানী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে আফ্ফান বিন মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমরা ইসমাঈল বিন উলাইয়্যার নিকট ছিলাম। সেই সময় এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করলো। তখন আমি বললাম : সে সৎ নয়। তখন এক ব্যক্তি (আমার কথা শুনে বলল) তুমি তার গীবত (পরনিন্দা) করলে। তখন ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা বললেন : সে তার গীবত করেনি বরং সে বিচার করেছে যে, সে সৎ বর্ণনাকারী নয় (ভূমিকা সহীহ্ মুসলিম ৭৭)।

এখানে আফ্ফান বিন মুসলিম হাদীস বর্ণনাকারীকে অসৎ বললে অপর এক ব্যক্তি এটাকে গীবত মনে করে কিন্তু হাদীসের বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও মুফতী (সিয়ারু আলামিন্নুবালা, নবম খণ্ড ইবনু উলাইয়্যাহ) ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা এটাকে গীবত মনে করছেন না।

ইমাম মুসলিম বলেন : আমাদের হাদীস বর্ণনাকরেছেন আমর বিন আলী আবু হাফস। তিনি বলেন : আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদের কাছে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি সুফইয়ান সাউরী, শুবা, মালিক এবং ইবনু উআইনাকে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি যে হাদীসের ক্ষেত্রে সৎ বর্ণনাকারী নয়; আর মানুষ আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে? (আমি কি তার অসততা তাদের বলে দিব?) তাঁরা সকলে বলেন : তার সম্পর্কে বলে দাও সে সৎ নয় (মুকাদ্দামা সহীহ্ মুসলিম ১/৫১)।

হাদীস বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হল, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দ্বীনের যেই বিধান প্রদান করেছেন তার প্রচার-প্রসার তথা তাবলীগ। তাই প্রশ্ন আসে আজও যারা বিভিন্নরূপে দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াত তাবলীগে নিয়োজিত যেমন দাঈ, বক্তা, লেখক, বিভিন্ন দাওয়াতি দল, জামাআত ও সংগঠন। তাদের মধ্যে যারা অসৎ এবং যারা ভুল-ত্রুটি ও অপব্যাখ্যাকারী এমনকী যারা শিরক ও বিদআতের আহ্বায়ক, তাদের ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করা গীবত হবে কি? আজ এই নীতি অবলম্বন সঠিক হবে কি যে সবাই যেহেতু ভাল উদ্দেশ্যে কাজ করছে, তাহলে করতে দিন ভুল-ত্রুটি ধরার প্রয়োজন নেই।

আজ সমাজে সালাফীগণই অসৎ দাঈ, মুবাল্লিগ ও দল ও সংগঠনের ত্রুটি উল্লেখে অগ্রনী ভূমিকা রাখে এবং এ কারণে তারা অনেকের নিকট নিন্দনীয়। কিন্তু এই নিয়ম সুফইয়ান সাউরী, শূরা বা মালিক এবং ইবনু উআইনাহ সহ সালাফদের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত। তবে ভুল-ত্রুটি বর্ণনার করারও একটি নিয়ম আছে, যা খেয়াল রাখা আবশ্যক।

৮। মানুষ পাপ করলে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায় তবে তাকে কাফের বলা যাবে না বরং সে ফাসেক চির জাহান্নামী। এমন বিদআতী মু'তাযিলী বিশ্বাসের খণ্ডন : মু'তাযিলা একটি প্রাচীন ভ্রান্ত ফেরকা। তাদের আক্বীদা হল, ইহজগতে কেউ পাপ করলে সেই পাপী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু তাকে কাফের বলা যাবে না এবং সে সবসময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে (শারহু মুকাদ্দামা সহীহ্ মুসলিম, নভবী ১/৬৮)। অনেকে এই মন্তব্যকে দুই স্তরের

মাঝের স্তর বলে থাকে (মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলাতাঈন)। কারণ তাদের বিশ্বাসানুযায়ী সে না তো মুমিন আর না কাফের; বরং উভয়ের মাঝে অবস্থানকারী। এই আক্বীদাহ সালাফদের নয়। সালাফগণের বিশ্বাস হচ্ছে, শিরক, কুফরী এবং বিশ্বাসগত নিফাক ব্যতীত পাপ করার ফলে কোনো ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয় না। সেই পাপী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তাওবা করলে এবং তার তাওবা কবুল হলে সে পাপমুক্ত হয়ে কিয়ামতে উঠবে। নচেৎ সে তার পাপানুযায়ী শাস্তি পাবে অতঃপর জান্নাতে যাবে কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যেমনটা মু'তাযিলা সম্প্রদায় মনে করে।

সহীহ্ মুসলিমের ভূমিকায় এমন মু'তাযেলি রাবীদের হাদীস গ্রহণ করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং এরা সহীহ্ হাদীস নিজ বিশ্বাসের পক্ষে যেভাবে ব্যবহার করত তারও উদাহরণ পেশ হয়েছে।

ইমাম মুসলিম বলেন : আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে আমর বিন আলী আবু হাফস। তিনি বলেন : আমি মুআয বিন মুআযের কাছে শুনেছি তিনি বলেন : আমি আউফ আবী জামীলকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমর বিন উবাইদ আমাদের হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আউফ বলেন : আল্লাহ্র কসম ! আমর মিথ্যা বলেছে। সে এ দ্বারা তার খবীস মত (মুতাযিলী বিশ্বাস) সাব্যস্ত করতে চায় (মুকাদ্দামা সহীহ্ মুসলিম ৬/৮)।

ইমাম নববী উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বর্ণনাটি সহীহ এবং তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসকে এই অধ্যায়ের পর বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীদের নিকট উক্ত হাদীসের অর্থ হল : সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের তরীকা/পন্থা, ইলম ও আমলের অনুসরণকারী। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উপমা হচ্ছে, যেমন কেউ তার সন্তানকে ঐ সময় ধিক্কার স্বরূপ বলে, যখন সেই সন্তানের কাজ তাকে অপছন্দ হয় : তুমি আমার সন্তান না। এই হাদীসের শব্দের মত যাবতীয় হাদীসের এই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। যেমন এই হাদীস (যে ধোকা দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়) (ব্যাখ্যা, ভূমিকা সহীহ্ মুসলিম ৬৮)।

ইমাম নববীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারাংশ হল, যাবতীয় এমন হাদীস যাতে এই শব্দ থাকবে যে, (যে এমন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা দলভুক্ত নয়) তার অর্থ এটা নয় যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কাফের হয়ে যায়; বরং ঐসব হাদীসের অর্থ হবে : ঐরূপ কাজ করা আমার তরীকা নয় কিংবা আমার নিয়ম নয়, কিংবা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু মুতাযিলীদের বিশ্বাস যেহেতু এই যে, পাপ করলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় তাই তাদের নিকট এমন হাদীসের অর্থ হবে, সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় আর সে মুমিন থাকে না। উপরোক্ত বর্ণনায় হাদীস বর্ণনাকারী আউফ আমর বিন উবাইদকে এ কারণে মিথ্যুক বলেনি যে, এই হাদীসটি অপ্রমাণিত; বরং তার মিথ্যুক বলার কারণ হচ্ছে সে হাসানের নিকট এই হাদীস না শোনার পরেও হাসান থেকে বর্ণনা করেছে এবং যেহেতু তার আক্বীদা হল, পাপ করলে পাপী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং চিরজাহান্নামী হয়ে যায়, তাই সে এই হাদীস দ্বারা নিজের আক্বীদা সাব্যস্ত করত: মুসলিমের উপর উত্তোলনকারীকে কাফের বলতে চায়, যা সালাফ তথা আহ্লে সুন্নাতের বিশ্বাস নয়; বরং বিদআতী মুতাযিলীদের বিশ্বাস (শারহু সহীহ মুসলিম ১/৬৮)।

এই মুতাযিলী সম্প্রদায় থেকে দ্বীন শেখা বৈধ নয় তাই সালাফগণ তাদের থেকে সতর্ক করতেন। হাদীসের পণ্ডিত আইয়্যূব সাখতিআনী একদা জানতে পারেন যে, সালাম বিন আবী মুত্বী মুতাযেলী আমরের কাছে যাওয়া আসা করে, তখন তিনি সালামকে সম্বোধন করে বলেন : যে ব্যক্তির দ্বীন সম্বন্ধে তুমি আশংকামুক্ত নও, তার হাদীস কি নিরাপদের হতে পারে? (ভূমিকা সহীহ্ মুসলিম ৬৯)

এ যুগের মুতাযিলী আক্বীদা ও মুতাযিলীদের বই পুস্তক পড়া থেকে সালাফীগণ অন্যদের সতর্ক করে থাকেন আর এটা সালাফদের নীতি কিন্তু আমাদের সমাজে এমনও লোক পাওয়া যায় যারা নির্দ্বিধায় মুতাযিলী আক্বীদা পোষণকারী লেখকের বই পুস্তক পড়ে থাকে বরং সে সকল তফসীর ও কিতাবদী তাদের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত ! আমরা বলবো : যে ব্যক্তির দ্বীন সম্বন্ধে আপনি আশংকামুক্ত নন, তার বই-পুস্তক কি নিরাপদের হতে পারে?

৯। কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারী থেকে সতর্ক থাকা ঃ প্রায় হাদীস সংকলনের যুগ থেকে এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটে।

গল্প-কাহিনি বলা তাদের পেশা ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রোতাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে, তাদের হাসাতে এবং কাঁদাতে গল্প আবিষ্কার করতো এবং তা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দিকে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিত। অর্থাৎ জাল কাহিনী হাদীস হিসাবে প্রচার করতো (আস্ সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা, সিবাঈ ১/৮৫)।

এমন সম্প্রদায় থেকে সালাফগণ লোকদের সতর্ক করতেন যেন তাদের থেকে কেউ হাদীস গ্রহণ না করে। এখনো সালাফীদের দাওয়াতী নিয়মে কেচ্ছা-কাহিনী বলে তাবলীগ করার নিয়ম নেই; যদিও প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত কাহিনী এবং সত্য কাহিনী বলার ইসলামে অবকাশ রয়েছে কিন্তু কিতাব-সুন্নাহ্কে দ্বিতীয় স্তরে রেখে কেচ্ছা-কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া কিংবা এমন বলা যে, সাধারণ মানুষদের জন্য কেচ্ছা বেশি উপকারী তারা বেশি আকৃষ্ট হয় তাই তাদের কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে তাবলীগ হওয়া উচিৎ এটা সালাফগণের নীতি নয়। যেমনটা আমরা আশে-পাশে কিছু তাবলীগকারীকে দেখে থাকি তারা জেনে বুঝেই কিতাব ও সুন্নাহকে প্রাধান্য না দিয়ে গল্পকে প্রাধান্য দেয় এমনকী বানোয়াট কেচ্ছারও আশ্রয় নেয়।

ইমাম মুসলিম তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, ইবনু যাইদ বলেন : আমাদের আসিম হাদীস বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : আমরা আব্দুর রহমান আস সুলামীর নিকট আসতাম সেই সময় আমরা যুবক বয়সী ছিলাম। তিনি আমাদের বলতেন : আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য গল্পকারদের নিকট যেও না এবং শাক্বীক থেকেও দূরে থাকিও (মুকাদ্দামা সহীহ্ মুসলিম ৬০)।

যেই শাকীক থেকে সতর্ক করা হয়েছে সে সম্পর্কে কাযী আয়ায বলেন : তিনি হচ্ছেন গল্পকার শাক্বীক আয যাব্বী আল কূফী (ব্যাখ্যা ভূমিকা সহীহ মুসলিম ১/৬০)।

১০। সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা এবং বিনা ইলমে ফতোয়া প্রদান না করা : ইমাম মুসলিম তাঁর স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন আবু আক্বীল বলেন : আমি কাসিম বিন উবাইদুল্লাহ্ এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদের নিকট বসে ছিলাম। ইয়াহইয়া কাসিমকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবু মুহাম্মাদ! আপনার মত লোকের ক্ষেত্রে এটা মন্দ যে, আপনাকে দ্বীনের কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে আর আপনার সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকবে না কোনো সমাধান থাকবে না! বর্ণনাকারী বলেন : তখন কাসিম তাকে বলেন : এমনটা কেন? কারণ আপনি হিদায়েতপ্রাপ্ত দুই ইমামের সুপুত্র আবু বাকর ও উমারের পুত্র। (কাসিমের বংশ পরম্পরা পিতার দিক দিয়ে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছায় এবং মাতার দিক দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তাই তিনি হিদায়েত প্রাপ্ত দুই ইমামের সুপুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।) বর্ণনাকারী বলেন : এমন শোনার পর কাসিম তাকে বললেন : আল্লাহ্র কসম! যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবগত তাঁর নিকট এর চাইতে মন্দ হচ্ছে যে, আমি এমন কিছু বলবো যার জ্ঞান আমার নিকট নেই কিংবা সৎ বর্ণনাকারী ছাড়া অন্যের কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করবো। রাভী বলেন : প্রশ্নকারী চুপ হয়ে গেল কোনো উত্তর করল না (শারহু মুকাদ্দামা মুসলিম ১/৫০)।

উক্ত বর্ণনায় দুটি বড় নীতি পাওয়া যায়। প্রথমটি হল, দ্বীনের কোনো বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াই সমাধান না দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হল, অসৎ প্রকৃতির লোক থেকে হাদীস বর্ণনা না করা তার থেকে জ্ঞান অর্জন না করা। এই দুটি নীতিই সালাফীগণের মাঝে বিদ্যমান। তাঁরা শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেন না এবং দলীল-প্রমাণের অবর্তমানে নিজ রায় কিয়াসের আশ্রয় নেন না। অনুরূপ যাঁচাই-বাছাই ছাড়া হাদীস প্রচার করেন না; বরং হাদীস বর্ণনার পূর্বে তা সহীহ্ না যয়ীফ এ বিষয়ে সতর্ক হয়েই তা প্রচার-প্রসার করেন।

ইমাম মুসলিমের মূল্যবান ভূমিকায় সালাফগণের বিভিন্ন বিষয়ে যে নীতি-নিয়ম ও পথ-পদ্ধতির বর্ণনা হয়েছে যে সবের সম্পর্ক বিশেষ করে আক্বীদার সাথে রয়েছে এ অধম তারই সামান্য কিছু আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যেন সালাফী ভাইগণ এ সবের মাধ্যমে উৎসাহ পান নিজ আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পান এবং কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই ভবিষ্যতে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকার মানসিকতা রাখেন। আর যা সত্য তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

শেষ পর্ব

ব্রেলভী তালীমাত (ব্রেলভীদের শিক্ষা)

শহীদ আল্লামা এহসান ইলাহী যাহীর লাহোরী (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ইসমাঈল শাম্‌শীর (রাহেমাহুল্লাহ্)

পানাহারের জন্য ব্রেলভীদের কুপ্রথা খতম, মুর্খ লোকেদের মধ্যে খুবই পরিচিত। ওদের মোল্লারা পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে এই কুপ্রথাকে চালু করে ইসলামের দুর্নাম ছড়িয়েছে। এই কুপ্রথাতে ওলামায়ে কেরামের সম্মানে আঘাত লেগেছে। আমাদের এখানে এই প্রথাকে আলেমদের জন্য গালি মনে করা হয়। এতে মোল্লাদের পেট ভর্তির সামগ্রী জোগাড় হয়। এছাড়া অন্য কিছু তাদের উদ্দেশ্য নয়।

এভাবে হুযূরেরা কোনো ধনীর বাড়িতে একত্রিত হয়ে ক্বুরআন মাজীদ খতম করে, তারপরে তার নেকী মৃত ব্যক্তিকে দান করে দেয়। ধনী ব্যক্তি আনন্দিত হয় যে, কিছু টাকার পরিবর্তে তার প্রিয়জনের বখ্‌শিশ হয়ে গেল। ওদিকে হুযূরেরা খুশী হয় যে, অল্প সময়ের বিনিময়ে বিভিন্ন রকমের খাদ্য পেলাম আর পকেট ভর্তি হল। অথচ হানাফী ফকীহগণ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ''মজুরী নিয়ে ক্বুরআন খতম করার সওয়াব পাঠকারী পায় না, মৃত ব্যক্তি কী করে পাবে?'' (মাহমূদ বিন আহমাদ হানাফী (রহঃ) এর লিখা শারহুদ্দিরায়াহ্)। ''এভাবে কক্বুরআন মাজীদ খতম করে মজুরী গ্রহণকারী ও দাতা উভয়েই গুনাহ্‌গার'' (বিগায়াহ্ শারহুল হিদায়াহ্ ৩/৬৫৫ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আবেদীন মজমুআহ রাসায়েলের ১/১৭৩-১৭৪পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''এরূপ করা কোনো মাযহাবেই জায়েয নয়, এর কোনো নেকী পাবে না।'' ইমাম শামীর বর্ণনা হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ''মজুরী নিয়ে ক্বুরআন মাজীদ পড়া তারপরে তার নেকী মৃতকে হেবা করা কারো দ্বারা প্রমাণ নাই। কেউ মজুরী নিয়ে ক্বুরআন মাজীদ পড়লে নেকী পায় না, সে আবার মৃত ব্যক্তিকে কীরূপে হেবা করবে?'' (উক্ত কেতাবের ১/১৭৫ পৃষ্ঠা)।

অপর দিকে আল্লাহ্ বলেন —

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا.

অর্থ ঃ আমার আয়াতের বদলে পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করো না। মুফাস্‌সীরগণ বলেছেন, ''বিনিময়ে মজুরী নিও না'' (তাফসীর তাবারী, ইবনে কাসীর ও কুরতুবী আরো অনেকে)। ''কিছু মানুষকে মজুরী দিয়ে ক্বুরআন মাজীদ খতম করানো তার নেকী মৃত ব্যক্তিকে হেবা করা সালাফে সলেহীন হতে প্রমাণ নাই, আর এভাবে মাইয়েতকে নেকী পৌঁছে না। এটা ঐরূপ যেমন কেহ মজুরী দিয়ে নফল নামায ইত্যাদি পড়িয়ে, তার নেকী মাইয়েতকে হেবা করে, এতে কোনো লাভ নাই। যদি কেহ অসিয়ত করে যে, তার মালের কিছু অংশ দিয়ে, ক্বুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করিয়ে সেই হেবা কারীকে দিয়ে দিবে এ অসিয়ত বাতিল'' (শারহুল আকীদাতুত্ ত্বহাবীয়া ৫১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মোট কথা এ বিদ্‌আত দ্বারা ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ হবে কিন্তু ধর্ম ও শরীয়তের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নাই।

ব্রেলভী হুযূরেরা ধন ও সম্পদ জমা করার জন্য তাবার্রুকাত নামে বিদ্‌আত চালু করেছে। যাতে জুব্বা ও পাগড়ীর যিয়ারাত করিয়ে পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ হবে। ব্রেলবী আলা হযরত লিখেছেন—''অলীদের তাবার্রুকাত আল্লাহ্‌র নিদর্শনভূক্ত কাজেই তার তাযীম করা জরুরী'' (মুকাদ্দামা (ভূমিকা) রিসালা বাদরুল আন্‌ওয়ার মজমুআহ রাসায়েলে আলা হযরত ২/৮ পৃষ্ঠা)। ''যে ব্যক্তি তাবার্রুক শরীফের মুনকির (অস্বীকারকারী) সে ক্বুরআন ও হাদীসের মুনকির ও চরম মুর্খ, ক্ষতিগ্রস্ত, প্রথভ্রষ্ট ও পাপী'' (বাদরুল্ আনওয়ার ১২ পৃষ্ঠা)। তাছাড়া এটাও লিখেছে ''রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে তাযীম করার এটাও একটা অঙ্গ যে, যে জিনিস হুযূরের জানা যাবে তার তাযীম করতে হবে'' (উক্ত কিতাব ২১ পৃষ্ঠা)।

''এর জন্য কোনো প্রমাণ পঞ্জীর প্রয়োজন নাই বরং যেটাই হুযূরে আক্‌দাসের পবিত্র নামে মশহূর হবে, তারই তাযীম করা ধর্মের নিদর্শন সমূহের ন্যায়'' (উক্ত কিতাব ৪ পরিচ্ছদ ৪৩ পৃষ্ঠা)।

যে কোনো বস্তুর সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর দিকে জুড়ে দাও আর তার যিয়ারাত (দর্শন) করিয়ে সদকা, খয়রাত, মানত সংগ্রহ আরম্ভ করে দাও। ঐ তাবার্রুকের সাথে আসলে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানার প্রয়োজন নাই।

তাযীমের পদ্ধতিও আহমদ রেযা বর্ণনা করেছেন। ''ঘরের দেওয়াল ও তাবার্রুকাত স্পর্শ, চুমা দেওয়া যদিও সে ঘরের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর যুগে ছিল না। তার প্রমাণ ...... পাগলের কথা ..... কেহ কত সুন্দর কথা বলেছে -

আমুররু আলাদদিয়ারি দিয়ারি লায়লা
উকাব্‌বিলু যাল জিদারি অ যালজিদারা।।

অমা হুববুদ দিয়ারি শাগফ্না কালবি।
অলাকিন হুব্বু মান্ সাকানাদ্ দিয়ারা।।

আমি যখন লায়লার শহরে যায়, তখন কখনো এ দেওয়ালকে চুমু খাই আবার কখনো ও দেওয়ালকে। শহরের প্রেমে নয় বরং শহরবাসীর প্রেমে'' (রিসালা আল বার্রুল মাকাল মাজ্মুআ রাসায়েল যুক্ত ২/১৪১ পৃষ্ঠা)। এমনকী বুযুর্গদের কবরে যাবার সময় চৌকাঠকেও চুমু দেওয়া জায়েয (রিসালা আল্ বারুর্ল মাকাল মাজমুআ রাসায়েল যুক্ত ২/১৫৯)।

ব্রেলভী জাতির নিকট মদীনা মুনাওয়ারা ও বুযুর্গদের কবরকে চুমু দেওয়াই শেষ নয় বরং মাযার ইত্যাদির ছবিকে চুমু দেওয়া দরকার। ব্রেলভী সাহেব বলেছেন, ''ওলামায়ে দ্বীনেরা পবিত্র জুতা, হুযূর সাইয়েদুল আফযালুস্ স্বলাত আকমালুস্ সালাম এর সুগন্ধ রওযার ছবি কাগজে তৈরি করে তাতে চুমু দেওয়া, চোখে ঠেকানো ও মাথায় রাখার আদেশ দিতেন'' (আবার্রুল মাকাল্ ফি কিব্লাতিল্ ইজলাল ব্রেলভীর লিখা ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

এছাড়া আরো লিখেছেন, ''ওলামায়ে দ্বীন ঐ ছবিকে রোগ নিরাময় ও উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম বলতেন'' (বদরুল আন্ওয়ার ফি আদাবিল আসার ৩৯ পৃষ্ঠা)।

ব্রেলভীদের আলা হযরত, হুযূরে আকরামের পবিত্র কল্পনা প্রসুত (মনগড়া) ছবির উপকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন — ''এই পবিত্র নকশা যার কাছে থাকবে, অত্যাচারী ও হিংসুক হতে রক্ষা পাবে। স্ত্রীলোক প্রসব বেদনার সময় ডান হাতে রাখলে সহজে প্রসব হবে। যে সব সময় রাখবে সম্মান পাবে। রসূলের রওযার যিয়ারত (দর্শন) লাভ করবে। যে সৈন্যের কাছে থাকবে সে যুদ্ধ হতে পালাবেনা, যে পথযাত্রীর কাছে থাকবে সে লুণ্ঠিত হবে না। যে জাহাজে থাকবে সেটা ডুববে না। যে মালে থাকবে সেটা চুরি হবে না। যে প্রয়োজনের জন্য অসিলা করা হবে পূর্ণ হবে। যে উদ্দেশ্যের জন্য কাছে রাখবে তা পূরণ হবে'' (উক্ত কেতাব ৪০ পৃষ্ঠা)।

এই নোংরামী ও জাহেলী যুগের নোংরামীতে কোনো পার্থক্য নাই। বিশ্বনেতা (সঃ) এই নোংরামীকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, এরা পুনরায় চালু করছে। ব্রেলভী খাঁন সাহেব আবার্রুল মাকালের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ ''পবিত্র জুতা যে মাটি স্পর্শ করেছে সম্ভব হলে তা চুমু দিবে, না হলে ছবিকেই চুমু দিবে।''

''এই নকশা তৈরির একটা লাভ এটাই যে, যে আসল রওযায়ে মুবারকের যিয়ারত করতে পারবে না, সে এটাকে যিয়ারত করবে ও আগ্রহ সহকারে চুমু দিবে, এই নমুনা আসল রওযার স্থলাভিষিক্ত'' (ঐ কিতাব ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

''হুযূর পুরনূর সাইয়েদে আলম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা মুবারকের সঠিক নকল নিঃসন্দেহে ধর্মীয় সম্মানের সামগ্রী, তার তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ঈমানওয়ালা মুসলিমের ঈমানের চাহিদা'' (বাদরুল আনওয়ার ৫৩ পৃষ্ঠা)।

ছবি দর্শনের নিয়ম নীতির বর্ণনায় লিখেছেন —''ঐ বস্তু সমূহ যিয়ারতের (দর্শনের) সময় মনে মনে নবী (সঃ) এর কল্পনা করবে ও বেশি মাত্রায় দরূদ পড়বে'' (উক্ত কিতাব ৮৬ পৃষ্ঠা)।

অন্যত্র লিখেছেন — ''নবী (সঃ) এর পবিত্র জুতার নক্শা স্পর্শকারীর কিয়ামতে অনেক মঙ্গাল হবে, দুনিয়াতে সুনিশ্চিত অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দময় জীবন কাটাবে। কিয়ামতের সফলতার আশায় চুমা দেওয়া দরকার, যে কেহ এই নক্শাতে নিজের কপাল ও গাল ঘষবে তার জন্য আশ্চর্য বরকত আছে'' (আহমদ রেযার মজমুআহ রাসায়েল ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

চিন্তা করুন ব্রেলভী হুযূরদের ঐ কীর্তি ও মূর্তি পূজাতে পার্থক্য আছে কি ? নিজ হাতে একটা ফটো তৈরি করে, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কল্পনা করে, চুমু দিয়ে চোখে ঠেকাবে ও গালে ঘষবে তার পরে বরকতের আশা করবে।

একদিকে ফটো ও প্রতিকৃতির এ প্রকার সম্মান প্রদর্শন, অপরদিকে আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যতের সাথে ধৃষ্ঠতা ও বেয়াদবীসূচক কথা লিখতে প্রাণ কাঁপেনি। লিখেছেন ''নাআল শরীফ (জুতার প্রতিকৃতি) এর উপরে বিস্মিল্লাহ্ লিখাতে কোনো দোষ নাই'' (মাজ্মুআহ্ রাসায়েল ২০৪ পৃষ্ঠা)।

মাজমুআহ রাসায়েলের সাথে যুক্ত বদরুল আন্ওয়ারের ৫০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় লিখেছেন — ''দর্শনকারীর কর্তব্য মুসলিমদের সাহায্যার্থে কিছু মানত করা, এভাবে দর্শনকারী ও যিনি দর্শন করাবেন উভয়ের সওয়াব হবে। একজন নেকী ও বরকত দিয়ে সাহায্য করল, অপরজন কিছু মাল দিয়ে সাহায্য করল। হাদীসে এসেছে তোমাদের মধ্য হতে যার পক্ষে মুসলিম ভায়ের উপকার করা সম্ভব সে যেন উপকার করে (দলীল গ্রহণের পদ্ধতি দেখুন)। হাদীসে আরো আছে বান্দা যখন তার ভায়ের মদদ করে আল্লাহ্ তখন বান্দার মদদ্ করেন। বিশেষতঃ তাবার্রুক

ওয়ালা সৈয়দ বংশের হলে তার খেদমত উঁচুদরের বরকত ও পূণ্যের।'' ইহাই হচ্ছে ব্রেলভীদের দ্বীন শরীয়তের মূল নীতি ও নিয়ম। জনগণকে বোকা বানিয়ে কীভাবে নিজেদের ব্যবসার উন্নতি করে, নিজেদের আলমারী ভরতে চাইছে।

এটা কি কল্পনা করা যেতে পারে যে, ইসলাম ছবি ও মূর্তির তাযীম করার আদেশ দিবে? তাকে চুমা দেওয়া ও হাতে ছোয়াকে বরকত লাভের কথা বলবে? তার উপরে চাদর চাপানোর প্রেরণা দিবে? কখনও নয়।

কোনো কোনো মোল্লারা ধর্মকে লাভদায়ক ব্যবসা তৈরি করে জনগণের মাল দুহাতে লুটবার জন্য এমন বিদ্আত তৈরি করেছে যা প্রকাশ্য কুরআন ও হাদীস বিরোধী ও উভয়ের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা। কেহ যদি সারা জীবন নামায না পড়ে, রোযা না রাখে তবুও মরার পরে পার্থিব ধনমাল খরচ করে বখশা যাবে। যাকে এরা 'হীলায়ে ইসকাত' নাম দিয়েছে। তার নিয়ম পদ্ধতি দেখুন ও ব্রেলভী ধ্যান দারণাকে ধন্যবাদ দিন।

''গায়াতুল্ ইহ্তিয়াত্ ফি জাওয়াযে হীলাতিল্ ইসকাত'' যেটা বাদ্লুল জাওয়ায (লাহোর ছাপা) কিতাবের সাথে যুক্ত আছে ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, ''মাইয়েতের বয়স অনুমান করে, মৃত পুরুষের ১২ বছর ও মৃত নারীর ৯ বছর (অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকার নিম্ন সীমা) কমিয়ে বাকী বয়সের হিসেব করতে হবে যে, কত ফরয পড়তে পারেনি বা কাযা আদায় করেনি। তারপরে প্রতি নামাযের জন্য সদকায়ে ফেৎরার সমতুল্য দান করতে হবে। ফিতরার পরিমাণ আধ সা গম অথবা এক সা যব। এই হিসেবে একদিনের ছয় ওয়াক্তের নামাযের মুক্তিপণ অনুমান ১২ সের এক মাসের ৯ মন আর সৌর বছরে ১০৮ (একশাত আট) মন।'' এর প্রমাণ কুরআন হাদীসের কোথাও নাই। আল্লাহ্ সূরা নিসার ১০ নং আয়াতে বলেন-

اِنَّ الَّـذِيْـنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (١٠)

নিশ্চয় যারা অন্যায় করে ইয়াতিমদের মাল খায় তারা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আগুনে নিজেদের পেট পূরণ করছে, অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।''

সূরা বাণী ইস্রাঈলের ১৫ নং আয়াতে বলেন ঃ—

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.

অর্থ ঃ অপরের বোঝা কেহই বহন করবে না।

সূরা নাজমের ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে বলেন ঃ—

اَلَّا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى(٣٨) وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (٣٩)

অর্থ ঃ কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। মানুষ যা আমল করবে তারই প্রতিফল পাবে।

কিন্তু, ব্রেলভী হুযূরেরা এই হীলা (টালবাহানা) বা চালাকী কোথা হতে গ্রহণ করেছে, তা আমরা জানিনা। এর প্রমাণ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে হতে পারে, ইসলামে এর অস্তিত্ব নাই।

ওরা বলছে, ''নিজ প্রিয়জনকে বখ্শাবার জন্য হয়তো কেহ এত বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় নাও করতে পারে। কাজেই হালকা করার জন্য আরো কিছু চালাকী করেছে যাতে সাধ্যের বাইরে মনে করে ছেড়ে না দেয়। যাদের হীলার সামর্থ নাই তাদের সম্পর্কে হীলাতুল ইস্কাত পুস্তিকার ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে ঃ— ''যারা দুনিয়া হতে বিদায় হয়েছে তাদের মঙ্গল কামনা ও ফকির আর গরীবদের (*পেট পূজারী ব্রেলবী মোল্লাদের*) প্রতি অহাবী ইত্যাদি লোকের সহানুভূতি নাই।'' ঐ পৃষ্ঠাতে পুনরায় লিখেছে ''যদি কেহ হিসাব মতে মুক্তিপণ দেয় সেটা খুবই ভাল কাজ।''

যদি পাড়ার সকলেই প্রিয়জনকে বখশাবার জন্য ঐ হীলা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে, তাহলে পাঁচ আঙ্গুল ঘৃতময় হয়ে যাবে। ঐ হীলাতে বেনামাযী ও রোযা চোরদের দল ভারী হবে, ব্রেলভী বড় মৌলবীদের আলমারী ভর্তি হবে। কিন্তু আযাবের হকদার বখশা যাবে না। কারণ ঐ হীলার কথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও উল্লেখ নাই। যে যা করবে সে আখিরাতে তার প্রতিফল পাবে। যদি নেক্কার হয় তাহলে 'হীলার' প্রয়োজন নাই, আর যদি পাপী হয় তা'হলে হীলাতে কোনো লাভ নাই।

বুড়ো আঙ্গুল চুম্বন করাও একটি বিদ্আত যার প্রমাণ কোনো হাদীসে নাই। ব্রেলভী হুযূরেরা এই বিদআতকে প্রমাণের জন্য মনগড়া, জাল ও মওযূ হাদীসের বর্ণনা উল্লেখ করে ফাতওয়া রেযবীয়ার সাথে যুক্ত 'মুনিরুল আইনাইন ফি হুক্মি তাক্বিলিল্ ইব্হামাইন' এর ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে — খিযর আলাইহিস্ সালাম হতে বর্ণিত আছে যে, ''যে ব্যক্তি 'আশ্হাদু আন্না' শুনে নিজ

বুড়ো আঙ্গুল দুটিকে চুমু দিয়ে চোখে ঠেকাবে তার চোখে কখনই ব্যথা হবে না।'' জনাব আহমদ রেযা (ব্রেলভীদের আসল গুরু) এই বর্ণনাটি ইমাম সাখাবী (রহঃ) হতে নকল করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম সাখাবী (রহঃ) বর্ণনাটি লিখার পর যা বলেছেন তা গোপন রেখে খিয়ানত করেছেন — ইমাম সাখাবী বণর্নাটি লিখার পর লিখেছেন ঃ—এই বর্ণনাটি কোনো সুফী নিজের কিতাবে লিখেছেন। তার বর্ণনা পঞ্জীতে যেসব বর্ণনাকারীর নাম এসেছে, তারা মুহাদ্দিসগণের নিকট অজ্ঞাত, অখ্যাত লোক (অর্থাৎ মনগড়া জাল বর্ণনা পঞ্জী), তাছাড়া খিযর (আঃ) এর নিকট কে শুনেছে তার উল্লেখ নাই (মাক্বাসিদুল হাসানা লিস্সখাবী রহঃ)।

ইমাম সাখাবী (রহঃ) যে বর্ণনাটি সুফীদের বিরুধ্বে ব্যবহার করেছেন এবং তার সমালোচনা করে মাওযূ, মনগড়া, জাল বলেছেন, আহমদ রেযা পূর্ণ ধোঁকাবাজীর সাথে অনৈস্লামিক বিদ্আত চালু করার জন্য তাকে দলীল রূপে ব্যবহার করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) 'তায়সীরুল মাক্বাল' গ্রন্থে লিখেছেন, ''বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমার সমস্ত বর্ণনা মওযু ও মনগড়া।''

তদনুরূপ ইমাম সাখাবী (রহঃ), মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ), মুহাম্মাদ তাহির ফাতনী (রহঃ), আল্লামা শাওকানী (রহঃ) ইত্যাদি আলেমগণ আঙ্গুল চুমার সকল বর্ণনাকে মওযু ও মনগড়া বলেছেন। প্রমাণের জন্য দেখুন - তাযকিরাতুল মওযুআত লিল্ ফাতনী (রহঃ), মওযুআতে মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ), আল ফাওয়ায়েদুল মাওযূআহ লিল্ ইমাম শাওকানী (রহঃ)।

কিন্তু জনাব আহমদ রেযা (ব্রেলভীদের মূল উস্তাদ) হঠকারিতা করে মুনিরুল আইনাইনে (ফাত্ওয়া রেযভীর সাথে যুক্ত) ২/৪৮৮ লিখেছেন ''বুড়ো আঙ্গুলকে চুমার অস্বীকার ইজমায়ে উম্মাতের বিরুদ্ধাচরণ।''

এছাড়া আরো লিখেছেন —''একে ঐ ব্যক্তি নাজায়েয বলবে, সাইয়েদুল আলম (সঃ) এর নাম শুনে যার গাত্র দাহ হয়।'' ঐ কিতাব ২/৪৯৬ পৃষ্ঠা।

ব্রেলভীদের নোংরামীর মধ্যে এটাও একটা যে, আহমদ রেযা লিখেছেন, ''লা ইলাহা অহ্দাহু লা শারীকালাহু পূর্ণটাই মাইয়েতের কাফনে লিখে দিলে, সে কবরের শাস্তি হতে নিরাপদে থাকবে, মুনকির, নাকীর তার কাছে আসবে না'' (ফতওয়া রিযবিয়া ৪/১২৭ পৃষ্ঠা)।

এভাবেই ব্রেলভীগণ আহাদনামা নামে একটি মনগড়া দুআ তৈরি করেছে যার কোনো প্রমাণ নাই। এ সম্পর্কে তাদের আকীদা যে, ''একে যার কাফনে রাখা হবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে'' (ফাতওয়া রিযবিয়া ৪/১২৯ পৃষ্ঠা)।

আহমাদ ইয়ার লিখেছেন ''আহাদনামা দেখেই মৃতু ব্যক্তির স্মরণ আসে যে, মুনকির, নাকীরকে কী জওয়াব দিতে হবে'' (জাআল হক ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

ব্রেলভীগণ ক্বুরআন ও হাদীস এমনকী হানাফী ফিকাহ্র বিরোধী, তারা এমন অনেক বিদ্আত করে যার প্রমাণ সালাফে স্বলেহীন হতে মিলবে না। তার মধ্যে কবরে আযান দেওয়াও একটা।

ব্রেলভী খাঁন সাহেব লিখেছেন — ''কবরে আযান দেওয়া মুস্তাহাব, এতে মৃত ব্যক্তির লাভ হয়'' (ফতওয়া রেযবিয়া ৪/৫৪ পৃষ্ঠা)। আরো লিখেছেন ''কবরের আযানে শয়তান পালায় ও বরকত নাযিল হয়'' (জাআল হক ১/৩১৫ পৃষ্ঠা)।

অথচ হানাফী ফিকাহ্ গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে এর বিরোধীতা করা হয়েছে। ইব্নুল্ হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেছেন, ''কবরে আযান ইত্যাদি দেওয়া অথবা অন্য বিদআত করা ঠিক নয়। হাদীসে সির্ফ এতটুকু প্রমাণ আছে- নাবী (সঃ) যখন জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যেতেন, তখন বলতেন 'আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিল মুমেনীন....' শেষ পর্যন্ত। এই বিদআত (আযান দেওয়া) হতে বাঁচা দরকার'' (আবাররুল মাক্বাল ফি কুবলাতিল ইজলাল্ ১৪৩ পৃষ্ঠা)। ইমাম শামী হানাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ''বর্তমানে কবরে আযানের প্রথা হয়েছে, এর কোনো প্রমাণ নাই। এটা বিদআত'' (বদরুল আনওয়ার ফি আদাবিল আসার ৩৮ পৃষ্ঠা)।

হামুদ বালখী (রহঃ) বলেছেন, ''কবরে আযানের কোনো মূল্যই নাই'' (উক্ত কেতাব ৪০ পৃষ্ঠা)।

মোট কথা এসব হচ্ছে ব্রেলভী শিক্ষাসমূহ যা সির্ফ ক্বুরআন ও হাদীস বিরোধী। অথচ ব্রেলবীগণ হানাফী ফিক্হার অনুসারী বলে দাবী করে।

আল্লাহ্র কাছে দুআ করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসারী হবার ও বিদআত হতে বাঁচার তাওফীক দান করুন।

اٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

কোয়ান্টাম মেথড : এক ভয়াবহ শিরকী ফেতনার নাম !

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

এই ফেতনা বাংলাদেশের হাজারও মুসলিমকে শিরক, কুফরী আর বিদআত করতে বাধ্য করছে। মেডিটেশনের আড়ালে ভণ্ড গুরুজীর রমরমা ব্যবসা।

আল্লাহ্ বলেন, ''আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন বা জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম'' (সূরাহ্ আল্ মায়েদাহ ৫/৩)।

''সত্যতম বাণী আল্লাহ্র কিতাব, সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদের আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা'' (সহীহ্ মুসলিম ২/৫৯৩)।

''যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে তালাশ করবে, তার নিকট থেকে তা কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'' (সূরাহ্ আল ইমরান ৩/৮৫)।

আল্লাহ্র বাণী এত স্পষ্ট হওয়ার পরেও একজন মুসলিমের জীবনে শান্তি খুঁজতে 'কোয়ান্টাম মেথড' এর সাহায্য নিতে হয় কেন এবং কোন সাহসে?

কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ —মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে কথিত অন্তর্গুরুর ইবাদাতে লিপ্ত করার অভিনব প্রতারণরা নাম হল কোয়ান্টাম মেথড। হাজার বছর পূর্বে ফেলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পাদ্রী ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ-সাধনার আধুনিক কলা-কৌশলের নাম দেওয়া হয়েছে মেডিটেশন।

হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সাময়িক প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে এক কল্পিত দেহ ভ্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে Science of Living বা জীবন যাপনের বিজ্ঞান। আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে ভুলে টাকাওয়ালা সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা এদের প্রতারণার ফাঁদে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছে অবলীলাক্রমে। ব্যয় করছে কথিত ধ্যানের পিছনে ঘন্টার পর ঘন্টা। ঢেলে দিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। অথচ একটা রঙিন স্বপ্ন ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। অন্যদিকে মুসলিম যারা এদের দলে ভিড়ছে, তারা শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত দুটিই হারাচ্ছে। নিম্নে আমরা এদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি যাচাই করব। কোয়েন্টামের পঞ্চসূত্র হল, প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, সুখী পরিবার ও ধ্যান। বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। সুখী মানুষের সবটুকু প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়াই রয়েছে কোয়ান্টামে। তাই কোয়ান্টামই হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দে আধুনিক মানুষের জীবন যাপনের বিজ্ঞান।

অন্যান্য ডিগ্রীর ন্যায় এখানকার ধ্যান সাধনায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে 'কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট' বলে শ্রুতিমধুর একটা ডিগ্রী দেওয়া হয়। তাদের প্রচার অনুযায়ী বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্মউন্নয়নের ধ্যান পদ্ধতির প্রবর্তক প্রফেসর এম.এই. আহমাদ নাকি ক্লিনিক্যালি ডেড হওয়ার পরেও পুনরায় জীবন লাভ করেন শুধু তাঁকে বাঁচতে হবে, ''তিনি ছাড়া দেশে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই' তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে (মহাজাতক, কোয়ান্টাম টেক্সট বুক, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ২২-২৪)। অর্থাৎ হায়াত-মউতের মালিক তিনি নিজেই।

প্রথমে বলে রাখি, মানবরচিত প্রত্যেক ধর্মেই স্ব স্ব নিয়মে ধ্যান পদ্ধতি আছে। হিন্দু-বৌদ্ধ, যোগী-সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে আমরা কিছুটা জানি। আল্লাহ্ প্রেরিত ঈসায়ী ধর্মে সর্বপ্রথম সন্যাসবাদের উদ্ভব হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন, ''আর সন্ন্যাসবাদ, সেটা তো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমরা তাদেরকে এ বিধান দিই নি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারি'' (হাদীদ ৫৭/২৭)।

এখানে আল্লাহ্ তাদেরকে দুইভাবে নিন্দা করেছেন।

১। তারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিদ্আত অর্থাৎ নতুন রীতির উদ্ভাবন করেছিল।

২। তারা নিজেরা যেটাকে আল্লাহ্র নৈকট্য মনে করে আবিষ্কার করেছিল, সেটার উপরেও তারা টিকে থাকতে পারেনি।

ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে ভ্রষ্টতার যুগে মা'রেফতের নামে বিদআতী পীর-ফকীররা নানাবিধ ধ্যান পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অতঃপর কথিত ইশকের উচ্চ মার্গে পৌঁছে হুয়া হু করতে করতে যখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে 'কাশফ' বা 'হাল' হয়, তখন নাকি তাদের আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। একে তাদের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ্ বা বাক্বা বিল্লাহ বলে। এরাই সূফী ও পীর-মাশায়েখ নামে এদেশে পরিচিত। অথচ এইসব মা'রেফতী তরীকার কোনো

অনুমোদন ইসলামে নেই। ধ্যানকে কোয়ান্টামের পরিভাষায় বলা হয় মেডিটেশন (Medetation)। যার প্রথম ধাপ হল 'শিথিলায়ন' যা মনের মধ্যে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করে। আর শেষ ধাপ হল মহা চৈতন্য (Super Consciousness)। যখন তারা বস্তুগত সীমা অতিক্রম করে মহা প্রশান্তির মধ্যে লীন হয়ে যায়। যদিও এর কোনো সংজ্ঞা তাদের বইতে সুস্পষ্টভাবে নেই। এক্ষণে কোয়ান্টামের সাথে অন্যদের পার্থক্য এই যে, অন্যেরা স্ব স্ব ধর্মের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করেছে ও স্ব স্ব ধর্মের নামেই পরিচিত পেয়েছে। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম মেথড সকল ধর্ম ও বর্ণের লোকদের নতুন ধ্যানরীতিতে জমা করেছে। খানিকটা সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর মত। তখন আবুল ফযল ও ফৈযীর মত সেকালের সেরা পন্ডিতবর্গের মাধ্যমে সেটা চালু হয়েছিল মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে। আর এ যুগে কিছু উচ্চ শিক্ষিত সুচতুর লোকদের মাধ্যমে এটা চালু হয়েছে ইসলাম থেকে মানুষকে সরিয়ে নেবার জন্য এবং শিক্ষিত শ্রেণিকে বিশ্বাসে ও কর্মে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার জন্য। যাতে ভবিষ্যতে এদেশ তার ইসলামী পরিচিতি হারিয়ে সেক্যুলার দেশে পরিণত হয়। মুনি-ঋষিরা ধ্যান করে তাদের ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামে ধ্যান করা হয় স্ব স্ব 'অন্তর্গুরু' কে পাওয়ার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে, ''অন্তর্গুরুকে পাওয়ার আকাংখা যত তীব্র হবে, তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। এ ব্যাপারে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের (পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪৭)। যেমন একটি ঘটনা বলা হয়েছে, 'ছেলে কোলকাতায় গিয়েছে। দুদিন কোনো খবর নেই। বাবা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। মাগরিবের স্বলাত পড়ে মেডিটেশন কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করতেই কোলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এল। ছেলে সিনেমা হলের গেটে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন শিগগীর ফোন করতে (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১)। এ রকমই উদ্ভট বহু গল্প তারা প্রচার করেছে।

এক্ষণে আমরা দেখব ইসলামের সাথে এর সম্পর্ক :

১। এটি তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সংঘর্ষিক এবং পরিস্কারভাবে শিরক। তাওহীদ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ কেন্দ্রিক। ইসলামের সকল ইবাদাতের লক্ষ্য হল আল্লাহ্র দাসত্ব ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা ও পরকালে মুক্তি লাভ করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনার লক্ষ্য হল অন্তর্গুরুকে পাওয়া। যা আল্লাহ্ থেকে সরিয়ে মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করে। এদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেন, ''আপনি কি দেখছেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্ বানিয়েছে? আপনি কি তার জিম্মাদার হবেন? আপনি কি ভাবছেন ওদের অধিকাংশ শুনে বা বুঝে? ওরা তো পশুর মত বা তার চাইতেপথভ্রষ্ট (ফুরকান ২৫/৪৩-৪৪)।

মূলতঃ ঐ অন্তর্গুরুটা হল শয়তান। সে সর্বদা তাকে রঙিন স্বপ্নের মাধ্যমে তার দিকে প্রলুব্ধ করে।

২। তারা বলে, মনকে প্রশান্ত করার মতো স্বলাত যাতে আপনি পড়তে পারেন সেজন্যই মেডিটেশন দরকার। কেননা স্বলাতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হুযুরিল ক্বালব, একগ্রচিত্ততা। এটা কীভাবে অর্জিত হয়, তা এখানে এলে শেখা যায় (প্রশ্নোত্তর ১৪২৭)।

জবাব : এটার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হল স্বলাত। এর বাইরে কোনো কিছুর অনুমোদন ইসলামে নেই।

আল্লাহ্ বলেন, ''তুমি স্বলাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য'' (সূরাহ্ ত্বহা ১৪)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন সংকটে পড়তেন তখন স্বলাতে রত হতেন'' (আবু দাউদ হাঃ/ ১৩১৯)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা স্বলাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে দেখছো'' (বুখারী হাঃ/৬৩১)।

আল্লাহ্ বলেন, ''যারা খুশু-খুযুর সাথে ফরয, নফল ও তাহাজ্জুদ স্বলাত নিয়মিতভাবে আদায় করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ সফলকাম মুমিন বলেছেন'' (মুমিনূন ১-২)।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আর স্বলাতে ধ্যান করা হয় না বরং এক মনে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে একান্তে আলাপ করে'' (বুখারী হা/৫৩১)।

সর্বোচ্চ শক্তির কাছে নিজের দুর্বলতা ও নিজের কামনা-বসনা পেশ করে সে হৃদয়ে সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভ করে এবং নিশ্চিত আশাবাদী হয়। অথচ মেডিটেশনের কথিত অন্তর্গুরুর কোনো ক্ষমতা নেই। তার সাধনায় নিশ্চিত আশাবাদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওটা তো স্রেফ কল্পনা মাত্র। স্বলাতে আল্লাহ্র ইবাদাত করা হয়। পক্ষান্তরে মেডিটেশনে অন্তর্গুরুর ইবাদাত করা হয়। একটি তাওহীদ, অপরটি শিরক। দুটিকে এক বলা দিন ও রাতকে এক বলার সমান। যা চরম ধৃষ্টতার নামান্তর।

৩। তারা বলে, কোয়ান্টাম মেডিটেশনের জন্য ধর্ম বিশ্বাস কোনো জরুরী বিষয় নয়। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। তাদের কার্যাবলীতে এর প্রমাণ রয়েছে।

যেমন এখন কোয়ান্টাম শিশু কাননে রয়েছে ১৫টি জাতি গোষ্ঠীর চার শতাধিক শিশু। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রামা, খ্রিস্টান, প্রকৃতি পূজারী সকল ধর্মের শিশুরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। আর এক সাথে গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসাবে (শিশু কানন)।

জবাব : মানুষকে সকল ধর্ম থেকে বের করে এনে কোয়ান্টামের নতুন ধর্মে দীক্ষা নেবার ও কোয়ান্টাম নেতাদের গোলাম বানানোর চমৎকার যুক্তি এগুলি। কেননা অন্তর্গুরুর ব্যাখ্যায় তারা বলেছে, আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে গেলে একজন আলোকিত গুরুর কাছে বায়াত বা দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া আধ্যাত্মিকতার সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যে কোনো সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন (টেক্সট বুক পৃঃ ২৪৭)। অর্থাৎ এরা আলোকিত মানুষ বানাচ্ছে না। বরং ইসলামের আলো থেকে বের করে এক অজানা অন্ধকারে বন্দী করছে। যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ''যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করবে, তা কবুল করা হবে না। ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'' (আল ইমরান ৮৫)। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি'' (আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭)। অতএব ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরাই কেবল আলোকিত মানুষ। বাকী সবাই অন্ধকারের অধিবাসী।

৪। তারা বলে, বহু আলেম আমাদের মেডিটেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এর সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই।

জবাব : অল্প জ্ঞানী অথবা কপট বিশ্বাসী ও দুনিয়াপূজারী লোকেরাই চিরকাল ইসলামের ক্ষতি করেছে। আজও করছে। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি বস্তু : (১) আলেমদের পদস্খলন, (২) আল্লাহ্র কিতাবে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন (দারেমী)।

মনে রাখা আবশ্যক যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব যা তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের আমলে দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল, কেবলমত্র সেটাই দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে। তার বাইরে কোনো কিছুই দ্বীন নয়।

৫। মেডিটেশন পদ্ধতি নিজের উপরে তাওয়াক্কুল করতে বলে এবং শিখানো হয় যে, 'তুমি চাইলেই সব করতে পারো।' এরা হাতে মূল্যবান 'কোয়ান্টাম বালা' পরেও তার উপরে ভরসা করে।

জবাব : ইসলাম মানুষকে মহাশক্তিধর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে শিখায় এবং আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। এর মাধ্যমে মুমিন নিশ্চিন্তে জীবন লাভ করে ও পূর্ণ আত্মশক্তি ফিরে পায়। আর ইসলামে এ ধরণের 'বালা' পরা ও তাবীয ঝুলানো শিরক (সহীহ্ হাদীস ৪৯২)।

৬। তারা বলে, শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন এক ক্ষমতা তৈরি হয়, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারে। এজন্য একটা গল্প বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সেখানে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যে উন্নতমানের একটা চাকুরী পেয়ে গেল (টেক্সট বুক পৃঃ ১১৫)।

জবাব : ইসলাম মানুষকে তাকদীরে বিশ্বাস রেখে বৈধভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বলে। অথচ কোয়ান্টাম সেখানে আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথিত মনছবির পূজা করতে বলে।

৭। কোয়ান্টামের মতে রোগের মূল কারণ হল মানসিক। তাই সেখানে মনছবি বা ইমেজ থেরাপি ছাড়াও 'দেহের ভিতরে ভ্রমণ' নামক পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরে নানা অঙ্গের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক ভ্রমণ করতে বলা হয়। এতে সে তার সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে এবং নিজেই কমাণ্ড সেন্টারের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। যেমন, একজন ক্যান্সার রোগী তার ক্যান্সারের কোষগুলিকে সরিষার দানা রূপে কল্পনা করে। আর দেখে যে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি ঐ সরিষা দানাগুলো খেয়ে নিচ্ছে। এভাবে আস্তে আস্তে সরষের দানাও শেষ, তার ক্যান্সারও শেষ (টেক্সট বুক পৃঃ ১৯৪)।

৮। এদের শোষণের একটি হাতিয়ার হল 'মাটির ব্যাংক'। যে নিয়তে এখানে টাকা রাখবেন, সে নিয়ত পূরণ হবে। প্রথমবারে পূরণ না হলে বুঝতে হবে মাটির ব্যাংক এখনো সন্তুষ্ট হয়নি। এভাবে টাকা ফেলতেই থাকবেন। কোনো মানত করলে মাটির ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। পূরণ না হলে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এখানে খাঁটি সোনার চেইন বা হীরার আংটি দিতে পারেন। ইমিটেশন দিলে মানত পূরণ হবে না (প্রশ্নোত্তর)। এর জন্য একটা গল্প ফাঁটা হয়েছে। যেমন মধ্যরাতে উঠে মাটির ব্যাংকে পাঁচশত টাকা রাখার সাথে সাথে মুমূর্ষ ছেলে সুস্থ হয়ে গেল (দুঃসময়ের বন্ধু...)।

প্রিয় পাঠক! বুঝতে পারছেন, কত সুচতুরভাবে মানুষকে

আল্লাহ্ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের কমান্ড সেন্টারে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেই সাথে মাটির ব্যাংকে টাকা ও গহনা রাখার ও তা কুড়িয়ে নেবার চমৎকার ফাঁদ পাতা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তা আরোগ্য দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র হুকুম আছে বলেই মুমিন ঔষধ খায়। ঔষধ আরোগ্যদাতা নয়। বরং আল্লাহ্ মূল আরোগ্যদাতা। এই বিশ্বাস তাকে প্রবল মানসিক শক্তিতে শক্তিমান করে তোলে। এজন্য তাকে মেডিটেশন বা কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মাটির ব্যাংকে টাকা রাখারও দরকার হয় না। বরং গরীবকে সাদক্বা দিলে তার গোনাহ মাফ হয় (মিশকাত হা/২৯)।

৯। অন্যান্য বিদআতীদের ন্যায় এরাও কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে মুসলিমদের ধোঁকা দিয়ে দলে ভিড়ানোর জন্য। যেমন —

(ক) 'সকল ধর্মই সত্য' তাদের এই মতবাদের পক্ষে সূরা কাফিরূনের 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন' শেষ আয়াতটি ব্যবহার করেছে। যেন আবু জাহলের দ্বীনও ঠিক, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দ্বীনও ঠিক। এই অপব্যাখ্যা ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিকরা ও তাদের পদলেহীরা করে থাকে। কোয়ান্টামের লোকেরাও করছে। অথচ ইসলামের সারকথা একটি বাক্যেই বলা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। একথার মধ্যে সকল ধর্ম ও মতাদর্শকে অস্বীকার করা হয়েছে। কোয়ান্টামের অন্তর্গুরু নামক ইলাহটিকেও বাতিল করা হয়েছে।

(খ) তারা বলে, মেডিটেশন একটি ইবাদাত। যা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হেরা গুহায় করেছেন। অথচ এটি স্রেফ তোহমত বৈ কিছু নয়। নিঃসঙ্গপ্রিয়তা আর মেডিটেশন এক নয়। তাছাড়া নাবী হওয়ার পরে তিনি কখনো হেরা গুহায় যাননি। সাহাবায়ে কিরামও কখনো এটি করেননি।

(গ) তারা সূরা জিন-এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলেছে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গায়েবের খবর জানাতে পারেন। অতএব যে তা জানতে চায় আল্লাহ্ তাকে সেই জ্ঞান দিয়ে দেন (প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না। এ সময় তিনি সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর রসূলের নিকট অহি প্রেরণ করেন এবং তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখেন। এই অহি-টাই হল গায়েবের খবর, যা কুরআন ও হাদীস আকারে আমাদের কাছে মওজুদ রয়েছে। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যু পর অহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব কোয়ান্টামের গুরুরা চাইলেও গায়েবের খবর জানতে পারবেন না।

(ঘ) তারা সূরা বুরূজ-এর অর্থ করে 'রাশিচক্র'। যাতে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে রাশিচক্র অনুযায়ী মানুষের ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ নির্ধারণের বিষয়টি তাদের শিষ্যদের মনে গেঁথে যায়। অথচ এটি হিন্দু ও তারকা পূজারীদের শিরকী আক্বীদা মাত্র।

(ঘ) তারা সূরা আলে ইমরানের ১৯১ আয়াতটি তাদের আবিস্কৃত মেডিটেশনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছে (প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)। ঐ সাথে একটি জাল হাদীসকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদাতের চেয়ে উত্তম (প্রশ্নোত্তর ১৭২৪)। অথচ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে গভীর গবেষণা একজন মানুষকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে। কোয়ান্টামের কথিত অন্তর্গুরুর কাছে যেতে বলে না। আর হাদীসটি হল জাল। যা আদৌ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী নয়। কোনো কোনো বর্ণনায় ৬০ বছর ও ১০০০ বছর বলা হয়েছে (সিলসিলাহ্ যঈফাহ্ হা ১৭১)।

পরিশেষে বলব, কোয়ান্টাম মেথডের পুরা চিন্তাধারাই হল তাওহীদ বিরোধী এবং শিরক প্রসূত। যা মানুষের মাথা থেকে বেরিয়ে এলেও এর মূল উদ্দ্যোক্তা হল শয়তান। মানুষকে জাহান্নামে নেবার জন্য মানুষের নিকট বিভিন্ন পাপকর্ম শোভনীয় করে পেশ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন (হিজর ৩৯)।

তবে সে আল্লাহ্র কোনো মুখলেস বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না (হিজর ৪০)। শয়তান নিজে অথবা কোনো মানুষের মাধ্যমে প্রতারণা করে থাকে। যেমন হঠাৎ করে শোনা যায় অমুক স্থানে অমুকের স্বপ্নে পাওয়া শিকড়ে বা তাবীযে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দু-পাঁচ মাস যাবৎ দৈনিক লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে হাজারো মুসলিমের ঈমান হরণ করে হঠাৎ একদিন ঐ অলৌকিক চিকিৎসক উধাও হয়ে যায়। এদের এই ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়েছিল সর্বপ্রথম নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর কওম। যারা পরে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমরাও যদি শিরকের মহাপাপ থেকে দ্রুত তাওবা না করি, তাহলে আমরাও তাঁর গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। অতএব হে মানুষ! সাবধান হও।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণের দৃশ্য দেখার পর কুরায়েশ নেতারা কী বলেছিল?

উ:— তারা বলেছিল এটা আবু কাবাশার পুত্রের (মুহাম্মাদের) জাদু। সে তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব তোমরা বহিরাগত লোকদের জিজ্ঞাসা কর। কেননা মুহাম্মাদ একসঙ্গে সবাইকে জাদু করতে পারবে না।

২। প্রশ্ন : কুরায়েশ নেতারা বুদ্ধি বৃত্তিক ও অলৌকিক সকল পন্থায় পরাজিত হয়ে কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল?

উ:— (ক) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কা'বায় তাওয়াফ করছিলেন এমতাবস্থায় আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্তালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ্, উমাইয়া বিন খালাফ, আস বিন ওয়ায়েল প্রমুখ নেতৃবর্গ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে আপোষ প্রস্তাব দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা ইবাদত করি তুমি যার ইবাদত কর এবং তুমি পূজা কর আমরা যার পূজা করি। আমরা এবং তুমি আমাদের কাজে পরস্পরের শরীক হই (ইবনু হিশাম ১/৩৫২)। (খ) যদি তুমি আমাদের কোনো একটি মূর্তিকে চুমু দাও, তাহলে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নিব। (গ) তুমি চাইলে আমরা তোমাকে এত মাল দেব যে, তুমি সেরা ধনী হবে। তুমি যাকে চাও তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। আর আমরা সবাই তোমার অনুসারী হব। কেবল তুমি আমাদের দেব-দেবীদের গালি দেওয়া বন্ধ কর। (ঘ) তুমি আমাদের উপাস্য লাত ও উযযার এক বছর পূজা কর এবং আমরা তোমার উপাস্যের এক বছর পূজা করব। এইভাবে এক বছর এক বছর করে সর্বদা চলবে।

৩। প্রশ্ন : আপোষকামী প্রস্তাবে বিফল হওয়ার পর তারা কী কৌশল অবলম্বন করেছিল?

উ:— অতঃপর তারা সাধারণ মুসলিমদের ফিরিয়ে আনার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ পেশ করল। সেরা ধনী অলীদ বিন মুগীরাহ্র নেতৃত্বে তারা নির্যাতিত-নিপীড়িত নও মুসলিমদের বলতে লাগলো যে, তোমরা পিতৃ ধর্মে ফিরে এলে তোমাদের জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ সাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এমনকী পরকালে তোমাদের পাপের বোঝা আমরাই বহন করব। যেমন আল্লাহ্ বলেন, কাফিররা মুমিনদের বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (২৯:১২)।

৩। প্রশ্ন : কুরায়েশ নেতারা রসূলের সামনে কী কী উদ্ভট দাবী সমূহ পেশ করে?

উ:— উৎবা, শায়বাহ্, আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেশ, আবুল বাখতারী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আলীদ বিন মুগীরাহ্, আবু জাহাল, উমাইয়া বিন খালাফ, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী উমাইয়া সহ ১৪ জন কুরায়েশ নেতা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কাবা চত্বরে ডেকে বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার প্রভুকে বল যেন (ক) তিনি মক্কার পাহাড়গুলিকে সরিয়ে এ স্থানটিকে সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেন। (খ) তোমার প্রভু যেন এখানে নদী সমহূ প্রবাহিত করে দেন। (গ) আমাদের সাবেক নেতা কুসাই বিন কিলাবকে জীবিত করে এনে দাও। (ঘ) তোমার প্রভু যেন তোমার সঙ্গে একজন ফেরেস্তা পাঠান, যিনি তোমার ব্যাপারে সত্যায়ণ করবেন। (ঙ) তুমি তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, যেন তোমার জন্য বাগ-বাগিচা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত প্রাসাদ বানিয়ে দেন। (চ) আমরা তোমার উপর ঈমান আনিনি বিধায় তোমার প্রভু যেন আমাদের উপর আকাশকে টুকরো টুকরো করে গযব হিসাবে নামিয়ে দেন, যেমনটি তুমি ধারণা করে থাকো। (ছ) তাদের একজন বলল, আমরা কখনই তোমার উপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে না নিয়ে আসবে। (জ) আরেকজন নেতা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনই তোমার উপরে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আসমান থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দিবে। অতঃপর তুমি তাতে আরোহণ করবে ও আল্লাহ্র কাছে চলে যাবে। অতঃপর সেখান থেকে চারজন ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে আসবে, যারা তোমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, তুমি যা বল, তা সত্য। উক্ত উদ্ভট দাবী সমূহের বর্ণনা ও তার জবাব পবিত্র কুরআনের সূরা বানী ইসরাঈলের ৯০-৯৩ ও ৯৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪। প্রশ্ন ঃ মক্কার নেতারা দুনিয়াবী স্বার্থের কী কী দাবী সমূহ পেশ করে?

উঃ— (ক) যদি তুমি সত্যই নাবী হয়ে থাকো, তাহলে সারা পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার আমাদের কাছে এনে দাও। (খ) আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের বিষয়গুলি বলে দাও। যাতে আমরা আগে

ভাগে সাবধান হতে পারি। (গ) তুমি একজন ফেরেশতাকে নাবী হিসাবে এনে দাও, আমরা তাকে মেনে নেব। কেননা তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র।

৫। প্রশ্ন ঃ উক্ত দুনিয়াবী স্বার্থের প্রশ্নসমূহের উত্তরে মহান আল্লাহ্ কী বলেন ?

উঃ— তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। আর আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত নই। আমি একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার নিকট অহী করা হয়। তুমি বল অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি কখনো সমান হয়? তোমরা কি চিন্তা করবে না (৬:৫০)।

৬। প্রশ্ন ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিরুদ্ধে মক্কার নেতারা কী কী অপযুক্তি পেশ করেছিল ?

উঃ— (ক) আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল হলে উনি কখনো মানুষের মত খাওয়া-দাওয়া ও বাজার-ঘাট করতেন না। (খ) তারা বলল, যদি নিতান্তই কোনো মানুষকে নাবী করার ইচ্ছা ছিল, তাহলে মক্কা ও ত্বায়েফের বিত্তবান প্রভাবশালী কোনো নেতাকে কেন নাবী করা হল না? (গ) যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তাহলে আমরা শির্ক করতাম না।

৭। প্রশ্ন ঃ উক্ত অপযুক্তি সমূহের জবাবে মহান আল্লাহ কী বলেন ?

উঃ— (ক) যদি আমরা কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হতো এবং তাকে ঐ ধরণের পোশাক পরাতাম যা তারা পরিধান করে (৬:৯)। তিনি, 'দেখ ওরা কীভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমা সমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না' (১৭:৪৮, ২৫:৯)। (খ) 'তারা কী তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করবে'? (৪৩:৩২)। অর্থাৎ আল্লাহ্ কাকে অনুগ্রহ করে নবুয়ত দান করবেন এটা কেবল তাঁরই এখতিয়ার। এতে অন্যের কিছুই করার নেই। (গ) 'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে না আমরা শির্ক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা। আর না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিররা (রসূলদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল' (৬:১৪৮)।

৮। প্রশ্ন ঃ মক্কার নেতাদের রসূলের বিরুদ্ধে যাবতীয় অপবাদ, অপকৌশল, অপযুক্তি ও লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় ?

উঃ— (ক) স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ও সমাজ নেতারা সত্যকে চিনতে ও জানতে পেরেও তাকে মেনে নিতে পারে না। (খ) সত্যকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য হেন অপকৌশল নেই, যা তারা অবলম্বন করে না।

৯। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দিক থেকে লোকেদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা কি বলত ?

উঃ— তারা বলত, আমরাও এরূপ বলতে পারি। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন, 'যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। এসব তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ভিন্ন কিছুই নয়' (৮:৩১)।

১০। প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা এবং এরূপ আমরাও বলতে পারি বলে দম্ভ প্রকাশ করলে তার জবাবে আল্লাহ্ কী বলেন ?

উঃ— মক্কায় পাঁচবার এবং মদীনায় একবার মোট ছয়বার সমস্ত জ্বিন-ইনসান একত্রিত হয়ে অনুরূপ দু-একটি সূরা বা আয়াত রচনা করে আনার জন্য কাফেরদের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন।

১১। প্রশ্ন ঃ উক্ত চ্যালেঞ্জগুলি পবিত্র কুরআনের কোন্ কোন্ সূরার কোন্ কোন্ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?

উঃ— মক্কায় সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর ৩৮, সূরা হূদ আয়াত নম্বর ১৩, সূরা ইসরা বা বানি ইসরাঈল আয়াত নম্বর ৮৮, সূরা তূর আয়াত নম্বর ৩৪ ও মদীনায় সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নম্বর ২৩-২৪।

১২। প্রশ্ন ঃ তারা কী উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল ?

উঃ— চ্যালেঞ্জ গ্রহণ তো দূরের কথা, বরং আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেস, আখনাস বিন শরীক্ব, আবু জাহাল প্রমুখ নেতারা একে অপরকে না জানিয়ে রাত্রিতে রসূলের তাহাজ্জুদের স্বলাতের কুরআন তেলাওয়াত শুনত।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলার চেষ্টা করলেও ফরয স্বলাত আদায় করে না এমন ব্যক্তির জবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া যাবে কি? দলীল সহ আলোচনা করে বাধিত করবেন। — জাযাহুমুল্লাহ্ খায়রা। — আব্দুর রহমান, বর্ধমান।

উত্তর ঃ যদি অস্বীকার পূর্বক স্বলাত ত্যাগ করে তাহলে সে সকলের ঐক্যমতে কা-ফির, ইসলাম হতে বহিস্কৃত কিন্তু যদি অবহেলা করে স্বলাত ত্যাগী হয় তাহলে এ বিষয়ে আহলুস্ সুন্নাহ্ আলিমগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল বলছেন যে, যেহেতু কালিমাহতে বিশ্বাসী সেহেতু কাবীরাহ্ গুনাহ্ হলেও সে মুমিন। অতএব সে সাজা ভোগের পর মুক্তি পাবে। অপর দলটি বলেন যে, যে সমস্ত হাদীসে স্বলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সেগুলি তার প্রকৃত অর্থে রয়েছে। সুতরাং সে ব্যক্তি কাফির। কোনো অমুসলিম 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে কোনো পশু জবেহ করলে যেমন হালাল হয় না অনরূপ এ ব্যক্তিও যেহেতু কাফির হয়ে গেছে সেজন্য তার জবেহকৃত পশুর মাংস বৈধ নয়।

যারা কাফির হয়ে যাবে বলে মতপোষণ করেছেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দলীলসমূহের অন্যতম হল —

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ " لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ "

سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ الْمَدَنِيَّ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীবৃন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইসলামের কোনো কর্মকে ছেড়ে দেওয়াটাকে কুফুর মনে করতেন না, স্বলাত ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত।"

এই হাদীসের শেষে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি আবূ মুসআব আল মাদানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ''যে ব্যক্তি বলবে, 'ঈমান শুধুমাত্র মুখে কালিমাহ্ উচ্চারণের নাম' তাকে প্রথমে তাওবাহ করতে বলতে হবে। তাওবাহ না করলে তাকে হত্যা করতে হবে" (সুনানুত্ তিরমিযী ২৬২২, হাদীস সহীহ্)।

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযীও স্বলাত পরিত্যাগীকে কাফির বলতে চেয়েছেন।

(২) মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যদি তাওবা করে ও তারা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই" (সুরাতুত্ তাওবাহ্ ১১)।

অতঃপর তাঁদের পরে দুষ্ট লোকেদের আগমন ঘটল, যারা স্বলাতকে বিনষ্ট করল। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা সত্ত্বর গাই' নামক নরকে প্রবেশ করবে কিন্তু যারা তাওবাহ করে ভাল-কর্ম করা শুরু করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না (সূরাহ্ মারিয়াম ৫৯, ৬০)।

আয়াত দুটিতে স্পষ্ট, একজন স্বলাত ত্যাগকারীর ঈমান বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে।

(৩) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় একজন মুমিন ও কাফির ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী বিষয় হচ্ছে স্বলাত ছেড়ে দেওয়া" (সহীহ্ মুসলিম ৮২)।

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে মূলতঃ তিন প্রকারের লোক ছিল। (ক) পাক্কা কাফির , (খ) পাক্কা মুনাফিক এবং (গ) পাক্কা মুসলিম। এতদ্ব্যতীত কেউ স্বলাত ত্যাগ করেছে আর তাকে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবীগণ মুসলিম বলে জানতেন বলে আমাদের কোনো দলীল জানা নেই। সুতরাং আলিমগণের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও দলীলের ভিত্তিতে এটাই ঠিক মনে হয়েছে যে, স্বলাত ত্যাগকারী কাফির। জবেহকৃত পশুর হালাল হওয়ার জন্য শর্তই হল মুসলিমের দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জবেহ হতে হবে। যেহেতু স্বলাত ত্যাগী ব্যক্তি মুসলিম নয় সেজন্য তার জবেহকৃত পশুর মাংস হতে দূরত্বে অবস্থান করাটাই শ্রেয়। তবে বিপক্ষের আলিমদের অবস্থানের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করতঃ কেউ যদি ভক্ষণ করে তাকে আমরা হারামখোর বলব না।

আল্লাহ্ আমাদের বিতর্কিত বিষয়ে যেটি উত্তম সেটিকে মেনে চলার তাওফীক প্রদান করুন — আমীন।

২। প্রশ্ন ঃ কেউ যদি স্বলাতের সময় আসার পূর্বেই আযান দেয়, তাহলে সে আযানের কি হবে? — আঃ হালীম, দঃ গরীবপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ— সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ বিষয়ে আলিমগণের দ্বিমত নেই। কেননা আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সময় হওয়ার পর আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (সহীহুল বুখারী ৬৫৮, সহীহ্ মুসলিম ২৯৩)। সুতরাং সতর্কতা উত্তম। আযান দিতে বিলম্ব হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া ঠিক নয়। কেউ যদি চূড়ান্ত সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে ফেলে তাহলে সময়ে পুনরায় আযান দিয়ে স্বলাত আদায় করতে হবে।

৩। প্রশ্ন ঃ মহিলারা একাকী হোক অথবা জামাআত সহকারে হোক স্বলাতের জন্য ইকামাত দেবে কি না। সহীহ্ সুন্নাহ্ দ্বারা জানাবেন। আবূ ফাহীম, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ফরয স্বলাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়াটা ফারযে কিফায়াহ। কোনো একজন আযান ও ইকামাত দিলে অন্যদের দিতে হবে না। গ্রাম হতে দূরান্তে কোনো একক ব্যক্তির আযান ও ইকামাত দেওয়ার কথা সহীহ্ বুখারীতে এসেছে (হাদীস নং ৬০৯)। তবে মহিলাদের আযান সংক্রান্ত কোনো বিধান শরীআতে বর্ণিত হয়নি। যেহেতু তাঁরা জামাআত পরিচালনা করার বিষয়ে পুরুষের অধীন। তবে তারা যদি পৃথক ভাবে স্বলাত আদায় করে অথবা মহিলাগণ পুরুষ শূন্য অবস্থায় জামাআত সহকারে স্বলাত আদায় করেন, তাহলে তারা ইকামত দেবেন। কেননা যে বিষয়ে শরীআত চুপ আছে সেখানে নারী পুরুষের বিধান একই। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৪। প্রশ্ন ঃ কাপড়ের তৈরি অর্থাৎ নাইলন, সূতী ইত্যাদি মোজার উপর মাসাহ্ করার বিধান কি? জনৈক মালদহের আলিম বলেন, কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ্ করা যাবে না। এ বিষয়ে সঠিকটি জানাবেন। — আব্দুল আলীম, মালদা।

উত্তর ঃ — যে কোনো প্রকার মোজার উপর মাসাহ্ জায়েয। পুরাতন উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ মোজার চামড়ার হতে হবে বলে মত প্রকাশ করলেও সঠিক এটাই যে, যেকোনো প্রকার মোজার উপর মাসাহ্ করা যাবে। বরং পবিত্র ও অযূ করা অবস্থায় মোজা পরে থাকলে অবশ্যই তাতে মাসাহ্ করাটাই সুন্নাহ্। মুখ্য বিবেচ্য বিষয় এখানে পা ঢাকা থাকা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জাওরাবের উপর মাসাহ্ করেছেন (সুনানু আবী দাউদ ১৫৯)। আবূ বাক্র ইবনুল আরাবী বলেন —

غِشَائَانِ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوْفٍ يُتَّخَذُ لِلدَّفْءِ.

জাওরাব ওকেই বলে যা উষ্ণতা অর্জনের জন্য পায়ে পরিধান করা হয় এবং তা উলের হয় (তাজুল উরুস, ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ)।

‘জাওরাব’ কে কেন্দ্র করে আওনুল মা’বূদের লেখক অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন, লিখেছেন, ‘‘কামূস আরাবী অভিধানের লেখক জাওরাবের ব্যাখ্যা করেছেন ‘লিফাফাতুর রিজ্‌ল বা পায়ের আচ্ছাদন হিসাবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা চামড়া, উল এবং সুতিরও হতে পারে (আওনুল মা’বূদ, ইবনুল কাইয়িমের টীকা সহ, ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃঃ)। আল্লামা ইবনু বায ও স্ব-লিহ আল উসাইমীন রাহিমাহুমাল্লাহ্‌গণও ঘন, পাতলা সমস্ত প্রকারের মোজাতে মাসাহ্ বৈধ হওয়ার ফাতাওয়া প্রদান করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। সুতরাং আমাদের নিকট যে কোনো প্রকার মোজাতে মাসাহের বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। আল্লাহু আলামু।

৫। প্রশ্ন ঃ স্বলাত শেষে অনেকেই পরস্পর পরস্পরকে সালাম ও মুসাফাহ্ করে এবং অনেকে বিশেষভাবে ইমামের সাথে সালাম ও মুসাফাহ্ করে, শরীআতে এর বিধান কী?

উত্তর ঃ ফরয স্বলাত শেষে সালাম ও মুসাফাহ্ সংক্রান্ত কোনো দলীল আমাদের জানা নেই। সুতরাং তা বিদ্‌আত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো কাজ করে যে বিষয়ে আমার কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত’’ (সহীহ্ মুসলিম, ১৭১৭)।

আমরা তো স্বলাত শেষ করার সময় ডানে এবং বামে অবস্থিত সকল মুসল্লীদের সালাম করে থাকি। অতএব এর কোনো প্রয়োজন নেই।

৬। প্রশ্ন ঃ মসজিদ-মাদ্রাসার জন্য সাহায্য গ্রহণ অথবা কোনো অভাবী মানুষের নিজের জন্য সাহায্য কামনা করার পর পেছনে যাওয়ার জন্য স্বলাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে? শাকিব, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

উত্তর ঃ না যাওয়া যাবে না। কাবীরাহ্ গুনাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘স্বলাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যক্তি যদি জানত, তাহলে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করাকে উত্তম মনে করত’’ (সহীহুল বুখারী, ৫১০, সহীহ্ মুসলিম ৫০৭)।

স্বলাত শেষ না হওয়া অবধি কাউকে চাওয়ার অনুমতি প্রদান করা উচিৎ নয়। কেননা কেউ স্বলাত আদায় করলে যেখানে কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ সেখানে, সে বক্তব্য শুরু কী করে করতে পারে।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১৩.৮.২০১৭ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তের আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব তাঁর দারসে কুরআনে সূরাহ্ মায়েদার ২৭ নং আয়াত থেকে ৩২ নং আয়াতগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর দুই পুত্র হাবীল এবং কাবীল উভয়েই কুরবানী করেছিল।এক জনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তখনকার রীতিনীতি অনুসারে হাবীলের বিয়ে কাবীলের যমজ বোনের সাথে আর কাবীলের বিয়ে হাবীলের যমজ বোনের সাথে হওয়ার কথা। কিন্তু কাবীল উক্ত রীতি না মেনে তার মন মতো জুড়ি বোনকে বিয়ে করতে চাইলে আদম (আলাইহিস্ সালাম) উভয়কেই কুরবানী পেশ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু দেখা গেল হাবীলের কুরবানীই গৃহীত হল। তা দেখে কাবীল হিংসার বশবর্তী হয়ে হাবীলতে হত্যা করতে চাইলেও হাবীল তাকে হত্যার জন্য তার হাত প্রসারিত করল না। শেষ পর্যন্ত কাবীল তার মনের মতো জুড়ি বোনকে বিয়ে করতে না পেয়ে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে ফেললো। ফলে সে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। আর এটাই হলো পৃথিবীর প্রথম হত্যা। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা আদম (আলাইহিস্ সালালম) এর ঐ প্রথম সন্তানের উপরেও পতিত হয়। কেননা সে-ই প্রথম ভূপৃষ্ঠে অন্যায় ভাবে রক্ত বইয়েছিল।''

অতএব দলীল গ্রহণেই মুক্তি। আর কুরবানীর জন্য অবশ্যই নিখুঁত পশুই গ্রহণযোগ্য কিন্তু পশুর নিখুঁত হওয়ার পূর্বেই অন্তরের নিখুঁত হওয়া বেশি প্রয়োজন। একথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। অতএব আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাতে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অন্য কেউ বিভ্রান্ত না হয়। আসুন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ মুতাবেক কুরবানী করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

অদ্যকার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ :—

১। আলোচ্য সূচী অনুযায়ী জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের স্বতন্ত্র রেজিস্ট্রেশন করা যায় কিনা এ ব্যাপারে সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ ব্যাপারে আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুপরামর্শের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের পক্ষ হতে 'ফেসবুক'-এর ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকার, সরকার বিরোধী কোনো কমেন্ট বা কোনো তথ্য শেয়ার বা লাইক করা যাবে না। উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘিত হলে জমঈয়তের সংগঠন থেকে তাকে বহিস্কার করা হবে। তবে কোনো জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে প্রথমে সে বিষয়ে জেলা সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৩। জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামে ২৬শে অক্টোবর, ২০১৭ বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ কাঁকুড়িয়া সরল পথ অ্যাকাডেমি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। উল্লেখযোগ্য আলোচক থাকছেন অসিউল্লাহ্ আব্বাস এবং মতিউর রহমান মাদানী। সম্মেলন 'শান্তি ও সংহতি সম্মেলন' হিসাবে চিহ্নিত হবে ইনশাআল্লাহ্।।

৪। পূর্ব নির্ধারিত ৫ হাজার করে টাকা আগামী মাসে অনাদায়ী ব্লকগুলো যথাযথভাবে ক্যাশিয়ারের হাতে জমা করতে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছেন।

৫। বিবিধ বিষয়ে আলোচ্য বিষয় হল - বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং এ রকম অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ বিদ্‌আত ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত বিষয় কিনা ? এ বিষয়ে জেলা জমঈয়তের পক্ষ হতে বিশেষজ্ঞের মতামতে প্রকাশ করা হয় যে, সাধারণভাবে পতাকা উত্তোলন ও অংশ গ্রহণ বিদআত নয় এবং শিরকও নয়, যদি না এর সঙ্গে বিদআত ও শিরকের কোনো বিষয় যুক্ত না হয়।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার কাজের সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই সেপ্টেম্বর — ১৫ই অক্টোবর)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহর	আসর	মাগরিব	এশা
১৬ সেপ্টে	৪:০৯	৫:২৩	১১:৩২	২:৫৯	৫:৪০	৬:৫৬
১৭	৪:০৯	৫:২৩	১১:৩২	২:৫৯	৫:৩৯	৬:৫৫
১৮	৪:১০	৫:২৪	১১:৩২	২:৫৮	৫:৩৮	৬:৫৪
১৯	৪:১০	৫:২৪	১১:৩১	২:৫৮	৫:৩৭	৬:৫২
২০	৪:১০	৫:২৫	১১:৩১	২:৫৭	৫:৩৬	৬:৫১
২১	৪:১১	৫:২৫	১১:৩১	২:৫৭	৫:৩৫	৬:৫০
২২	৪:১১	৫:২৫	১১:৩০	২:৫৬	৫:৩৪	৬:৪৯
২৩	৪:১১	৫:২৫	১১:৩০	২:৫৬	৫:৩৪	৬:৪৯
২৪	৪:১২	৫:২৬	১১:২৯	২:৫৫	৫:৩২	৬:৪৭
২৫	৪:১২	৫:২৬	১১:২৯	২:৫৪	৫:৩১	৬:৪৬
২৬	৪:১৩	৫:২৭	১১:২৯	২:৫৪	৫:৩০	৬:৪৫
২৭	৪:১৩	৫:২৭	১১:২৮	২:৫৩	৫:২৯	৬:৪৪
২৮	৪:১৩	৫:২৭	১১:২৮	২:৫৩	৫:২৮	৬:৪৩
২৯	৪:১৪	৫:২৮	১১:২৮	২:৫২	৫:২৭	৬:৪২
৩০	৪:১৪	৫:২৮	১১:২৭	২:৫২	৫:২৬	৬:৪১
১ অক্টোবর	৪:১৫	৫:২৮	১১:২৭	২:৫১	৫:২৪	৬:৪০
২	৪:১৫	৫:২৯	১১:২৭	২:৫০	৫:২৩	৬:৩৯
৩	৪:১৫	৫:২৯	১১:২৬	২:৫০	৫:২২	৬:৩৮
৪	৪:১৬	৫:৩০	১১:২৬	২:৪৯	৫:২১	৬:৩৭
৫	৪:১৬	৫:৩০	১১:২৬	২:৪৯	৫:২০	৬:৩৬
৬	৪:১৬	৫:৩০	১১:২৬	২:৪৮	৫:২০	৬:৩৫
৭	৪:১৬	৫:৩০	১১:২৬	২:৪৮	৫:২০	৬:৩৫
৮	৪:১৭	৫:৩১	১১:২৫	২:৪৭	৫:১৯	৬:৩৪
৯	৪:১৮	৫:৩২	১১:২৫	২:৪৬	৫:১৭	৬:৩২
১০	৪:১৮	৫:৩২	১১:২৪	২:৪৬	৫:১৬	৬:৩১
১১	৪:১৮	৫:৩২	১১:২৪	২:৪৫	৫:১৫	৬:৩০
১২	৪:১৯	৫:৩৩	১১:২৪	২:৪৪	৫:১৪	৬:২৯
১৩	৪:১৯	৫:৩৩	১১:২৪	২:৪৪	৫:১৩	৬:২৮
১৪	৪:২০	৫:৩৪	১১:২৩	২:৪৩	৫:১২	৬:২৭
১৫	৪:২০	৫:৩৪	১১:২৩	২:৪৩	৫:১১	৬:২৭

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা • জিলকাদাহ্ - ১৪৩৮ • আগষ্ট - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র
Printed by : S.F. Printers, Beldanga, 9434531957